বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ : আমাদের আত্মপরিচয়

সৈয়দ আলী আহসান

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ : আমাদের আত্মপরিচয়

সৈয়দ আলী আহসান

সালেহ বুক স্টল
২/৫ হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট
(২য় তলা), সিলেট।

বাড কম্প্রিন্ট এণ্ড পাবলিকেশন্স ❑ ঢাকা

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ :
আমাদের আত্মপরিচয়

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ ❑ ঢাকা বইমেলা ২০০২

প্রকাশক ❑ মোঃ শিহাব উদ্দিন বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স ৫০ বাংলাবাজার, পাঠকবন্ধু মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০, ফোন : ৭১১১৯৯৩ কম্পিউটার সেটিং ❑ বাড কম্প্রিন্ট, ৫০ বাংলাবাজার মুদ্রণে ❑ মেরাজ প্রেস, প্যারীদাস রোড, ঢাকা প্রচ্ছদ ❑ মুক্তো, আইডিয়াল কম্পিউটার গ্রন্থস্বত্ব ❑ লেখক

মূল্য ❑ ৬০.০০ টাকা মাত্র US $ 5.00

ISBN-984-839-011-006

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্মরণে
যিনি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের
মৌলিক প্রবক্তা ছিলেন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বাংলাদেশের সংস্কৃতি ১৫
বাংলাদেশের মানুষের জাতিসত্তা ইতিহাসগত পরিপ্রেক্ষিত ৫৪
বাংলাদেশী জাতীয়তা ৬৯
আমাদের আত্মপরিচয় ৭৭

www.pathagar.com

প্রস্তাবনা

জাতীয়তাবাদ শব্দটি পাশ্চাত্যের সৃষ্টি। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আপনাপন ভূ-খণ্ড সম্প্রসারণের জন্য এক ধরনের জাতীয়তাবাদের কথা উত্থাপন করেছিল বিভিন্ন সময়ে। এই জাতীয়তাবাদ হচ্ছে বংশের মূলগত একটি বৈশিষ্ট্য– যাকে ইংরেজিতে 'এথনিসিটি" (Ethnicity) বলা হয়। যেমন ধরা যাক জার্মানী জাতি। এক সময় এই জাতি সমুদ্র পার হয়ে ইংল্যাণ্ডের ভৌগোলিক সীমানায় নিজেদের বিস্তার করেছিলেন। আমরা ইংল্যান্ডের ভাষা যদি পরীক্ষা করি তাহলে শুরুতে ওল্ড জার্মানী ভাষাকে পাই। পরবর্তীতে এটা পরিবর্তিত হয়ে অ্যাঙ্গো স্যাকশন রূপ ধারণ করে। এভাবেই একটি জাতিসত্তা বিবিধভাবে নিজেকে প্রসারিত করে নতুন নতুন জাতিসত্তা নির্মাণ করেছে। কোন জাতিসত্তাই চিরকাল অপরিবর্তিত থাকে না। ক্রমশ তার পরিবর্তন হয় এবং নতুন নতুন ক্ষেত্রে গিয়ে এই জাতিসত্তার বলিষ্ঠ বিভাজন হয়ে থাকে। হিটলার যে আর্য জাতিসত্তার কথা বলেছিলেন এবং যে জাতিসত্তা একত্রিত হয়ে বিভিন্ন অঞ্চল দখল করেছিল তার ফলে একটি বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এটা মনে রাখতে হবে যে মৌলিক যে জাতিসত্তা থাকে সেই জাতিসত্তা বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে তার রূপের বিবর্তন ঘটে এবং পরিশেষে ভৌগলিক সীমানা-লব্ধ একটি নতুন জাতিসত্তায় পরিণত হয়। আমেরিকায় অনেক দেশের লোক এসে অনেক জাতির প্রভাব নিয়ে বহুকাল বসবাস করছেন এবং একটি ভৌগোলিক প্রশাসনের মধ্যে সমন্বিত রূপ পাচ্ছে। নিগ্রোরা এসেছিল দাসরূপে এবং ইউরোপীয় বহু দেশের মানুষ এসেছিল নিজেদের জন্য সৌভাগ্য গড়ে তুলতে। এভাবে আমেরিকায় জাতিসত্তাগত বিভিন্ন বিশ্লেষণ একীভূত হয়ে একটি ভৌগোলিক জাতিসত্তায় পরিণত হয়েছে। এটাই জাতিসত্তার ধর্ম। ব্রাজিলে পর্তুগীজরা এসেছিল, তারপর এসেছিল স্পেনীয়রা, এক সময় কিছু আরবরাও এসেছিল। পরিশেষে জাপানীরাও এসেছিল। এভাবে বিভিন্ন জাতিসত্তা মিলিত হয়ে ব্রাজিলের জাতিসত্তা নির্মাণ করেছে এবং বর্তমানে একটি ভৌগোলিক জাতিসত্তায় পরিণত হয়েছে। ব্রাজিলের আদিম অধিবাসীরা এখনও আমাজান নদীর তীরে বসবাস করে। তারা

www.pathagar.com

পতিত এবং অগ্রাহ্য হয়েছে। এই অগ্রাহ্য হওয়ার কারণ হল প্রথমত তাদের সংখ্যা কম ছিল; দ্বিতীয়ত অস্ত্রশস্ত্র আধুনিক ছিল না; তৃতীয়ত বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগসূত্র না থাকার দরুণ তারা অন্তর্গত নিষ্ঠার মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। তাদের জীবনে আদিম যুগ প্রবাহমানতার সংকল্পের মধ্যে তারা আদিমকাল থেকে বসবাস করছিল। ইউরোপের লোকেরা যখন ব্রাজিলে এলো তখন শক্তির দর্পে এবং ক্ষমতার দর্পে নিজেদের জন্য নতুন বাসভূমি নির্মাণ করলো এবং ব্রাজিলকে নিজেদের আয়ত্তে আনলো। সংকল্প এবং শক্তি তাদেরকে নতুনভাবে অধিকার দিল এবং দেশগত একটি নতুন জাতিসত্তা তৈরি হল। এভাবেই সাধারণত মৌলিক জাতিসত্তার বিলোপ ঘটে এবং বিভিন্ন জাতি ভাষা ও বর্ণ নির্বিশেষে একটি বিশেষ সীমানার মধ্যে নতুন জাতিসত্তা নির্মাণ করে এটাই মৌলিক সত্য।

আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। এর একটি ভৌগোলিক সীমানা আছে। সেই সীমানার মধ্যে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষ বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত। এই সম্পৃক্ততা ইতিহাসগত, সংস্কৃতিগত এবং আকাঙ্ক্ষাগত। অর্থাৎ আমরা বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের সঙ্গে চূড়ান্তভাবে সম্পর্কযুক্ত। জাতিগতভাবে আমরা বিভিন্ন জাতিসত্তার সংমিশ্রণ। এক সময় মুণ্ডা জাতি বাংলাদেশে বসবাস করত। সে কখন কোন যুগে তা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না। বর্তমানে মুণ্ডারা ছোট নাগপুরে বাস করে। তারা যে কি করে ছোট নাগপুরে গেল এবং বাংলাদেশের আশ্রয় চিরকালের জন্য ছেড়ে দিল তার ঐতিহাসিক বিবরণ কোথাও নেই। কিছু কিছু শব্দের মধ্যে অংক গণনার মধ্যে এবং স্থানবাচক নামের মধ্যে প্রমাণ পাওয়া যায় যে এদেশে এককালে মুণ্ডারা বাস করতো। আর্যাবর্ত থেকে যারা এসেছিল তারা এদেশে চিরস্থায়ীভাবে থাকেনি এবং এদেশকে অনার্য দেশ বলে অভিহিত করেছিল। এর ফলে বাংলাদেশের একটি স্বাতন্ত্র্য অনুভব করা যায়। বহু প্রাচীন যুগে বাংলাদেশের মানুষ যে সমস্ত জীবিকা অবলম্বন করেছিল সে সমস্ত জীবিকার কারণে তারা আর্যদের দৃষ্টিতে নিম্নশ্রেণীর মানুষ হিসেবে গণ্য হল। প্রাচীন দোহাকোষে এবং বৌদ্ধগানে এদের অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। পরে ক্রমশ বহিরাগতদের আবির্ভাব ঘটলো। কাঙ্গুকুব্জ এবং কর্নাটক থেকে ব্রাহ্মণরা এলো। ব্রাহ্মণদের আসার ফলে এখানকার মানুষদের জীবনে শ্রেণীবিভাগ ঘটলো। এই শ্রেণী বিভাগে এ

www.pathagar.com

অঞ্চলের আদিম মানুষগুলো আর্যদের চোখে নিম্নশ্রেণীর মানুষ হিসেবে গণ্য হল। বহিরাগত ব্রাহ্মণদের অহমিকা ছিল প্রচণ্ড। এই অহমিকা যুগ যুগ ধরে তারা লালন করেছে এবং সেই কারণে তারা উচ্চবর্ণের মানুষ বলে গণ্য হয়েছে। ব্রাহ্মণদের অহমিকা এবং প্রতিপত্তি দেখে এ দেশের নিম্নবর্ণের লোকগুলো ব্রাহ্মণ হবার চেষ্টা করেছে। পণ্ডিত ক্ষীতি মোহন সেন শাস্ত্রী তার 'জাতিভেদ' নামক গ্রন্থে যুক্তি প্রমাণসহ উল্লেখ করেছেন যে বাংলাদেশের সকল ব্রাহ্মণ কিন্তু মৌলিক নয়। এদের অনেকেই রূপান্তরিত ব্রাহ্মণ। বর্ণভেদে কার্যকর করবার চেষ্টা থাকলেও এবং আদিতে তথা কথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের কেউ কেউ ব্রাহ্মণে পরিণত হয়েছে। প্রধানত বিত্ত সঞ্চয়ের কারণে উচ্চ সমাজে তাদের পক্ষে আরোহণ করা সম্ভবপর হয়েছিল। আর্যদের সমাজগত শ্রেণীবিভাগ প্রাচীন বাংলাদেশে কোনদিন স্থায়ী হতে পারেনি। আমরা সে সময়কার বৌদ্ধদের ইতিহাস জানি। বৌদ্ধ সমাজে শ্রেণীবিভাগ একেবারেই ছিল না। যে ধরনের শ্রেণী বিভাগ বৌদ্ধদের মধ্যে ছিল তা হচ্ছে ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ। গৌতম বুদ্ধের বিচারে সৎ মানুষ নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য সংসার ত্যাগী ভিক্ষু হবে এবং যারা ভিক্ষু হবে না তারা পঞ্চশীল পালন করে গৃহী হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বৌদ্ধদের মধ্যে সামাজিক উঁচু-নীচু ভেদ ছিল না। ভেদ ছিল একটিই সেটি হচ্ছে ধর্মীয় আচরণগত নিষ্ঠার কারণে কেউ ছিল ভিক্ষু, কেউ ছিল গৃহী। এ দুটি বিভাজন সমাজের কোন স্তর বিন্যাসে কোন প্রভাব বিস্তার করে না। ভিক্ষুদের কোন পারিবারিক জীবন নেই। তারা নির্বাণের জন্য উন্মুখ। কিন্তু গৃহীদের সংসার জীবন আছে এবং আচরণের শুদ্ধতার জন্য সংসারই তাদের কাছে আশ্রমতুল্য।

বাংলাদেশ অঞ্চল এক সময় বৌদ্ধ অধ্যুষিত ছিল। এক সময় জৈনরাও বাংলাদেশে বাস করত। জৈন সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছে কিন্তু বৌদ্ধ সম্প্রদায় এখনও বাংলাদেশে আছে। জৈন সমাজের কোন লক্ষণ আমাদের দেশের সামাজিকতার মধ্যে নেই। কিন্তু বৌদ্ধদের বিনয় এবং শ্রেণীসত্তা রহিত জীবন আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে সত্য হয়ে আছে। এর একটি মাত্রই কারণ, ইসলাম যখন এদেশে প্রবেশ করলো তখন ইসলামের শ্রেণীহীন সমাজও বাংলাদেশে প্রবেশ করলো। এভাবে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বৌদ্ধ ও মুসলমান একীভূত হয়ে গেল।

www.pathagar.com

ধর্মের দিক থেকে আলোচনা করতে গেলে বাংলাদেশ অঞ্চলে সাম্য, মৈত্রী এবং শুদ্ধতার সমাজ প্রতিষ্ঠা ঘটলো।

ইসলাম বাংলাদেশে এসেছে বৌদ্ধ পাল রাজত্বের সময়। আরব দেশের একজন নাগরিক বাংলাদেশে এসেছিলেন পাল রাজত্বকালে ধর্মপালের সময়। তিনি স্বদেশে ফিরে তার ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছিলেন। সেই বৃত্তান্তে পালদের সুশাসন, মানবপ্রীতি এবং শ্রেণীবিহীন সমাজের বিবরণ আছে। আরো বিবরণ আছে জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতিফলনে। রাজতন্ত্র থাকলেও রাজারা প্রজার হিতার্থে কাজ করতেন। পাল রাজত্বকালের অনেক শিলালিপি পাওয়া গিয়েছিল। সে সমস্ত শিলালিপিতে জনকল্যাণের অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় পাল রাজত্বকালে সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা ভাবা হত এবং মানুষের দুরবস্থা দূর করবার জন্য প্রশাসনের আগ্রহ ছিল এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। পাল রাজত্বের পর বহিরাগত সেনারা এদেশে এসে রাজত্ব করেছে, কিন্তু শাসকবৃন্দ নিজেদেরকে সাধারণ মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এর ফলে একটি প্রবল বিভাজন তৈরি হয়েছিল শাসক সম্প্রদায় ও জনসাধারণের মধ্যে। সেনরা কখনই এদেশবাসীর সঙ্গে একাত্ম হতে পারেননি। সেই কারণে তাদের পতন ঘটে অতি দ্রুত। এর পরে ইখতিয়ার উদ্দিন বিন বখতিয়ার খিলজি বাংলাদেশে আগমন করেন এবং ইসলাম কার্যকরভাবে বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করে। মসজিদ নির্মিত হয় এবং তার ফলে স্থাপত্য শিল্পে নতুন মাত্রা যোগ হয়। বৌদ্ধ আমলে বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় বৌদ্ধ স্তূপ এবং বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেনরা এগুলোর অনেকগুলো ধ্বংস করে। এখনও কিছু বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন বিদ্যমান আছে। বৌদ্ধ স্তূপ এবং হিন্দু মন্দিরের মধ্যে এক আশ্চর্য মিল আছে। সে মিল এসব মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ আলো-বাতাসবিহীন অন্ধকার। এই উভয় ধর্মাবলম্বীর কাছে মন্দিরের অভ্যন্তর ছিল বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। অর্থাৎ বৌদ্ধ এবং হিন্দুরা আরাধনার জন্য নির্জনতা বেছে নিয়েছে। কিন্তু মুসলমানরা যখন মসজিদ নির্মাণ করলো সে মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। মসজিদের নির্মাণ কৌশল এমনটা ছিল যে বহিররূপ এবং অন্তরঙ্গের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। বাইরের পরিসর এবং অভ্যন্তরের পরিসর একত্রিত হয়ে একটি সামগ্রিক পরিসর নির্মাণ করেছে। স্থাপত্য শিল্পে এভাবেই একটি নবযুগের সূচনা হল।

www.pathagar.com

এদেশে মুসলমানদের দ্বারা আরবী এবং ফারসী এ দুটি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হল। ব্যাকরণের সহজতার কারণে এদেশের লোকেরা ফারসীকে গ্রহণ করলো। সুকুমার সেনের মতে, ফারসীকে গ্রহণ করার ফলে এই দেশে বাংলা ভাষার চর্চা সফলতা লাভ করে। সংস্কৃত ভাষা এদেশে এসেছিল সেনদের আমলে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয়নি। তার কারণ এর কোন কথ্যভঙ্গি ছিল না। সংস্কৃত ভাষা কখনই মানুষের মুখের ভাষা ছিল না। হিন্দুরা এ ভাষাকে দেব ভাষা বলেছেন এবং সে কারণে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা এই ভাষার আলেখ্য থেকে দূরে থেকেছেন। এভাবেই আমরা দেখি যে এদেশে সাধারণ মানুষের জন্য ফারসী ভাষা চালু হয় এবং ক্রমশ বাংলা ভাষা জন্মলাভ করে। যাই হোক এভাবে বঙ্গদেশ অঞ্চলে প্রথমে বৌদ্ধ, পরে হিন্দু এবং অবশেষে মুসলমানদের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশ বর্তমানে যে অঞ্চল নিয়ে গঠিত অতীতেও প্রায় সেসব অঞ্চল বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ এক কথায় বাংলাদেশের লোকজীবন, লোকশ্রুতি এবং সংস্কৃতি অতীতে যে রকম ছিল নিজস্বতা নিয়ে গড়ে উঠেছিল, আজো সেই রকম নিজস্বতা নিয়ে তার প্রসার ও প্রবৃদ্ধি গড়ে উঠবে এটাই আমরা আশা করি। পশ্চিমবঙ্গ আমাদের অঞ্চল থেকে ভিন্ন। প্রথমত আর্যদের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে যতটা পড়েছে পূর্ববঙ্গে ততটা পড়েনি। দ্বিতীয়ত সংস্কার ও মানসিকতার দিক থেকে পূর্ববঙ্গ প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল। তৃতীয়ত বাংলা ভাষা উভয় অঞ্চলেই ছিল, কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে পূর্ববঙ্গের বাংলা ভাষা পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষা থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল। এক কথায় বলা যায় আমাদের স্বভাব ও প্রকৃতি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি থেকে ভিন্নভাবে গড়ে উঠেছিল। পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে ভারতের একটি অঞ্চল। ভারতের প্রধান যে ভাষা অর্থাৎ হিন্দী তার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের উপর পড়েছে এবং এটা খুবই স্বাভাবিক যে ভারতের মূল সাংস্কৃতিক প্রেরণা এবং রাজনৈতিক অনুভূতি পশ্চিমবঙ্গেও প্রসারিত হয়েছে। বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ব্যবধান অনেক বেড়েছে– সাংস্কৃতিক ব্যবধান, আচারগত ব্যবধান এবং সংকল্পের ব্যবধান অত্যন্ত প্রকাশ্যভাবে গড়ে উঠেছে এবং এভাবে গড়ে ওঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সুতরাং আমরা

www.pathagar.com

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে একটি সাজুয্য রক্ষা করে একটি মানসিকতা তৈরি করতে পারি না। আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে প্রথম যখন বাংলাদেশ হল তখনকার দিনে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে একটি অন্তরঙ্গতা আমরা কল্পনা করেছিলাম। সেই অন্তরঙ্গতা যে ভুল ছিল এটা ক্রমশ স্পষ্ট হল। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য। ভারতের মেধা ও মনন পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত প্রসারিত। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গকে আমাদের সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠভূমি ভাবা অত্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলক। তারা ভারতবাসী এবং ভারতবাসী হিসেবেই তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক থাকবে। বাঙালি হিসেবে আমাদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সম্পর্ক গড়ে তোলা অসমীচীন এবং অসম্ভব।

আমরা আমাদের দেশকে বাংলাদেশ বলেছি। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আমরা শুধুই বাংলাদেশী এবং একান্তভাবে বাংলাদেশী। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এভাবে চিন্তা করিনি। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াই প্রথম এভাবে চিন্তা করতে শেখালেন। তিনি ক্ষমতায় এসেই 'বাংলাদেশী' কথাটা বহুলভাবে প্রচারিত করলেন। বাংলাদেশ সূত্রে আমরা যে বাংলাদেশী তা পৃথিবীর মানুষ স্বীকার করে নিয়েছে। আমাদের ভূখণ্ড আলাদা, ভূখণ্ডগত অঙ্গীকার আলাদা এবং জীবন ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে বাংলাদেশী প্রেরণায় এবং এটাই আমাদের রক্ষাকবচ।

– সৈয়দ আলী আহসান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সংস্কৃতি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাংস্কৃতিক নীতিমালা চিহ্নিত করতে গিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইউনেস্কো কতকগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৮২ সালে মেক্সিকো শহরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলো বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত হয়। সংস্কৃতির ব্যাখ্যাসূত্রে সম্মেলন ঘোষণা করে।

"ব্যাপকতর অর্থে সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির অথবা সামাজিক গোত্রের বিশিষ্টার্থক আত্মিক, বস্তুগত, বুদ্ধিগত, এবং আবেগগত চিন্তা এবং কর্মধারার প্রকাশ। শিল্প ও সাহিত্যই একটি মাত্র সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বস্তু নয়, মানুষের জীবনধারাও সংস্কৃতির অঙ্গ। মানুষের অধিকার, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসও সংস্কৃতির অঙ্গ।

"সংস্কৃতি মানুষকে নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার অধিকার এবং ক্ষমতা প্রদান করে। আমরা যে বিশেষভাবে যুক্তিবাদী মানুষ যে মানুষের বিচার-বুদ্ধি আছে এবং ন্যায়ের প্রতি আনুগত্য আছে তা আমরা অনুভব করতে পারি সংস্কৃতির মাধ্যমে। সংস্কৃতির মাধ্যমেই আমরা মূল্য নিরূপণ করি এবং ভাল-মন্দের মধ্যে নির্বাচন করতে শিখি। সংস্কৃতির মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে, আত্মসচেতন হয়, নিজের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে বোধ জন্মে, নিজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বোধ জন্মে, নিজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শেখে, অনবরত নিজের সীমা অতিক্রম করে দক্ষতা অর্জন করে।"

উক্ত সম্মেলনে সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান বা আইডেনটিটি সম্পর্কে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ ঃ

১. প্রত্যেক সংস্কৃতি জাতিসত্তার ঐতিহ্যকে প্রকাশ করে এবং কতকগুলো অপরিবর্তনীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রত্যেক জাতি তার সংস্কৃতির মাধ্যমে পৃথিবীতে তার উপস্থিতিকে সুচিহ্নিত করে।

২. সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানের সুনিশ্চয়তার মাধ্যমে একটি জাতি তার স্বাধীন বোধকে প্রমাণিত করে, অপরপক্ষে বিরোধী সংস্কৃতির আগ্রাসন জাতিসত্তার অভিজ্ঞানকে ধ্বংস করে।

www.pathagar.com

৩. সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ তার অতীতকে আবিষ্কার করে, অতীতের প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ হয় এবং বাইরের পৃথিবীর কাছ থেকে কল্যাণপ্রদ বস্তু গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়। একটি জাতি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখে পৃথিবীর সকল অঞ্চল থেকেই শুভ ও কল্যাণকে গ্রহণ করে সৃষ্টিধর্মিতার মধ্যে অগ্রসর হতে পারে।

৪. পৃথিবীর সকল প্রকার সংস্কৃতিই মানবজাতির ঐহিত্য। একটি জাতির সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান বলিষ্ঠ ও তাৎপর্যবহ হয় বিভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে। সংস্কৃতি এক প্রকার সংলাপের মত। সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি সমৃদ্ধমান হয়, বিনিময় না থাকলে যে কোন সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৫. কোন একটি একক সংস্কৃতি তার সর্বজনীনতা স্বীকৃত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। পৃথিবীর অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়তেই হবে এবং এ সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে সে তার নিজের অস্তিত্ব প্রমাণিত করবে। সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

৬. বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় না, বরঞ্চ আদান প্রদান সহজ ও সুন্দর হয় সংস্কৃতির বহুবচনতা যাকে আমরা ইংরেজিতে বলি প্লুরালিজম বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করেই তৈরি হয়ে থাকে।

৭. মানুষের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতিকে সম্মান করা এবং সংরক্ষণ করা।

৮. একটি জাতির সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা এবং অভিজ্ঞান সংস্কৃতির দ্বারাই চিহ্নিত হয়। মনে রাখতে হবে সংস্কৃতির মাধ্যমে আত্মিক, মানসিক এবং পার্থিব ইচ্ছার বিকাশ ঘটে থাকে। যথার্থ উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি মানুষের কল্যাণ। মনে রাখতে হবে সকল উন্নয়নের মূলে রয়েছে মানুষ। সুতরাং কোন দেশের জন্য সাংস্কৃতিক নীতি-নির্ধারণ করতে গেলে সে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এবং জীবন-যাপনের ব্যবস্থাকে সম্মান করতে হবে।

৯. সংস্কৃতি জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হয় এবং জনগোষ্ঠীর কাছেই প্রত্যাবর্তন করে। সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা, অধিকার সকল শ্রেণীর মানুষেই পাবে, কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষ নয়। সুতরাং সকল মানুষ যাতে সংস্কৃতির সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে সে কারণে সকলের জন্য শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করতে হবে এবং সকলকেই সমান সুযোগের অধিকার দিতে হবে।

১০. একটি জাতির সংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসেবে যে সমস্ত বিষয় গণ্য হবে তা হচ্ছে শিল্পীদের শিল্প সংস্কৃতি, সাহিত্যিকদের সাহিত্য সাধনা, স্থপতিদের

www.pathagar.com

নির্মাণকর্ম, সংগীত শিল্পীদের সংগীত, নৃত্য শিল্পীদের নৃত্য ব্যঞ্জনা, বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার এবং অনুসন্ধান কর্ম, মানুষের ধর্মবোধ এবং সেই সমস্ত মূল্যবোধের সুকৃতি যা জীবনকে অর্থদান করে। অধিগম্য এবং অনধিগম্য সকল কর্ম, মানুষের ভাবপ্রকাশের ভাষা, সামাজিক রীতি-নীতি, বিশ্বাস, ঐতিহাসিক নিদর্শন নৃতত্ত্ব, গ্রন্থাগার সবকিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

১১. পৃথিবীতে বহু দেশে অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে বহু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। শিল্পায়ন ও প্রযুক্তির অপরিকল্পিত প্রয়োগের ফলে সংস্কৃতিতে আঘাত লেগেছে। আবার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ঔপনিবেশিকতা, বৈদেশিক প্রভাব সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত করে। সুতরাং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি দেশ তার স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে।

ইউনেস্কোর উক্ত বিবেচনাগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা বাংলাদেশে আমাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারি এবং মূল্য নির্ধারণ করতে পারি। যুগ যুগ ধরে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি বলে যা গড়ে উঠেছে তা চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এই সমস্ত সাংস্কৃতিক লক্ষণগুলোকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করা প্রয়োজন। আমাদের দৃষ্টিতে বহির্বিশ্ব তিনটিঃ একটি হচ্ছে পাশ্চাত্য জগৎ, আরেকটি হচ্ছে প্রাচ্য জগৎ এবং তৃতীয়টি হচ্ছে মুসলিম জগৎ। এই তিনটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের আদান-প্রদানের প্রয়োজন। এই আদান-প্রদানের মাধ্যমে সংস্কৃতিগতভাবে আমরা লাভবান হব এবং আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আমরা সমৃদ্ধ করতে পারব। পৃথিবীর সকল দেশেই একক সাংস্কৃতিক অনুসন্ধান চলছে এবং ইউনেস্কো সেই অনুসন্ধানে সাহায্য করছে। এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে সক্ষম হব আবার সঙ্গে সঙ্গে আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজেদেরকে বর্তমান বিশ্বের সমকালীন করতে পারব। আমরা বর্তমানে যে পৃথিবীতে বাস করছি সে পৃথিবী দ্রুতভাবে আদান-প্রদানের দিক থেকে সংকুচিত হয়ে পড়ছে। অর্থাৎ আমরা একে অন্যের খুবই নিকটবর্তী হয়ে পড়ছি। এই নিকটবর্তিতা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আমাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে সুচিহ্নিত করবার প্রয়াস পাব।

বাংলাদেশ কর্কটক্রান্তির ২০.৩৪ ও ২৬.৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮.০১ ও ৯২.৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। দেশটি ভারতীয় ভূখণ্ড দ্বারা প্রায় সর্বাংশে পরিবেষ্টিত। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বার্মার সঙ্গে বাংলাদেশের কিছুটা সংযোগ আছে। আবার সম্পূর্ণ দক্ষিণ সীমান্ত জুড়ে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৪,০০০ হাজার বর্গ কিলোমিটার এবং এর প্রায় সবটাই সমতল। মূলত

www.pathagar.com

বাংলাদেশে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার একটি বদ্বীপ। বাংলাদেশের কিছুটা পাহাড়ী অঞ্চল আছে, কিছুটা উত্তর-পূর্বে এবং দক্ষিণ পূর্বে, প্রধানতঃ চট্টগ্রাম এলাকায়। সমগ্র দেশটি বহু নদী এবং শাখা নদীতে পরিপ্লাবিত। বাংলাদেশ একটি গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত। বছরে গড়ে এর উত্তাপ ১৮.৯° সেলসিয়স থেকে ২৯° সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়। বছরে বৃষ্টিপাত পশ্চিমাঞ্চলে ১৬০ সেন্টিমিটার থেকে ২০০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ও দক্ষিণ পূর্বে ২০০° থেকে ৪০০° সেন্টিমিটার পর্যন্ত এবং উত্তর-পূর্বে ২৫০° থেকে ৪০০° সেন্টিমিটার পর্যন্ত। বাংলাদেশে ছয়টি ঋতু– গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত প্রতি দুই মাস নিয়ে এই ঋতু বিরাজন তবে শরৎ ও হেমন্তের খুবই ক্ষণকালীন এবং গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ও বসন্তই মুখ্য ঋতু হিসেবে পরিলক্ষিত।

সমগ্র বাংলাদেশকে একটিমাত্র সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ভিন্নতর সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসহ কিছু নৃত্য ও গীত আছে যেগুলো মূল সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য এনেছে। সাংস্কৃতিক স্বভাব এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালায় একটি ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। অল্প-বিস্তর কিছু পার্থক্য থাকলেও মূলতঃ সমগ্র দেশটি একটি সাংস্কৃতিক বৃত্তে আবদ্ধ। ধর্মভিত্তিক বিভাজন ছাড়া এখানকার জনগোষ্ঠীকে নৃতাত্ত্বিকভাবে বিবিধ গোত্রে ভাগ করা যায় না। এদেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর একটি বিস্ময়কর মিশ্রণ ঘটেছে যার ফলে বর্তমানে শারীরিক গঠনের দিক থেকে আচার অনুষ্ঠানের দিক থেকে এবং পারিবারিক ব্যবস্থাপনা এবং সম্পর্কের দিক থেকে খুব বেশি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ভাষার দিক থেকে একটি বাংলা ভাষাই সকল অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় এরকম আঞ্চলিক উপভাষা খুবই কম। একমাত্র চট্টগ্রামের আঞ্চলিক উপভাষার কিছু বিশিষ্টতা আছে। বস্তুতঃপক্ষে সকল আঞ্চলিক উপভাষার উৎস একই অর্থাৎ বাংলাভাষা। শুধুমাত্র উপজাতীয়দের কিছু কিছু ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী রয়েছে এই উপজাতীয়দের অধিকাংশই চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বিভিন্ন উপকরণের মিশ্রণ ঘটেছে। স্থানীয় লৌকিক উপকরণের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু উপকরণ সংমিশ্রিত হয়েছে। ধর্মীয় প্রভাবটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রধান এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্ম হিসাবে ইসলামের প্রভাব বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে একটি প্রবল প্রভাব। এর সঙ্গে হিন্দু প্রভাব, বৌদ্ধ প্রভাব এবং খ্রীষ্টান প্রভাব মিলিত হয়েছে।

মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ১৯৮২ সালের সম্মেলনের একুশ সংখ্যক প্রস্তাবে বলা হয় যে, যুবকদের চরিত্র এবং মানসিকতা গঠনের জন্য ধর্ম এবং

www.pathagar.com

আত্মিক আদর্শ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর সকল দেশেই এই গুরুত্ব অল্প বিস্তর তারতম্যসহ বিদ্যমান। সেই কারণে ইউনেস্কো মনে করে যে, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক চৈতন্যের মূলে ধর্মের প্রভাব আছে। সুতরাং পৃথিবীর সকল দেশের কর্তব্য হচ্ছে ধর্ম ও আত্মিক চৈতন্যকে যথার্থ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক নীতিমালা নির্ধারণের সময় ধর্মের স্থান সম্পর্কে সচেতনভাবে চিন্তা করা। সুতরাং এক্ষেত্রে ইউনেস্কোর প্রস্তাব হচ্ছে ঃ

১. একটি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সে দেশের ঐতিহাসিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা।

২. সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আত্মিক চৈতন্যকে পূর্ণ মর্যাদা প্রদান।

৩. ধর্মের একটি আন্তর্জাতিক বিশিষ্টার্থক এবং সর্বমানববাদী রূপ আছে। সেই রূপকে সংরক্ষণ করা এবং তার সঙ্গে সংস্কৃতিকে সমন্বিত করা।

৪. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতিতে যে আত্মিক মূল্যবোধ বা স্পিরিচ্যুয়াল ভ্যালুজ রয়েছে আপনাপন সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে সে মূল্যবোধকে মর্যাদা দেওয়া।

ইউনেস্কোর সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে আমাদের দেশের সামগ্রিক জনসাধারণের কাছে ধর্মীয় বিশ্বাস সংস্কৃতির অঙ্গনে একটি জীবন্ত শক্তিরূপে সক্রিয়।

বাংলাদেশে প্রধানত ধর্মীয় বিশ্বাস এবং প্রেরণা সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিষ্টান সকলের ক্ষেত্রেই ধর্মবিশ্বাসটি জীবনের প্রেরণার উৎস। এদেশের বিভিন্ন উৎসবের উৎস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে সেগুলোর প্রায় সব কটিই ধর্মভিত্তিক। ধর্মভিত্তিক হয়েও সকল উৎসব আয়োজনের মধ্যে একটি উদারতা সহনশীলতা এবং সকল শ্রেণীর মানুষকে এক সঙ্গে গ্রহণ করার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস আলোচনা করে বাংলাদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসমূহ উপস্থাপনার প্রয়াস পাব।

সংস্কৃতি শব্দটির অর্থ অত্যন্ত জটিল। সংস্কৃতির সঙ্গে জীবনের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মানুষের জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্প-নীতিবোধ, আইনকানুন, প্রথা এবং আরো বহুবিধ বিষয় যার সাহায্যে মানুষ একটি সমাজ এবং একটি জাতির সদস্য হয়। মানুষের কর্মসাধনের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির স্বভাব নিহিত থাকে, মানুষের উচ্চারণের মধ্যে সংস্কৃতির স্বভাব নিহিত থাকে এবং

www.pathagar.com

মানুষের আদর্শের মধ্যে সংস্কৃতির প্রজ্ঞা বহমান থাকে। প্রতিদিন মানুষ যে জীবন-যাপন করছে সে জীবন-যাপনের কর্মপ্রবাহই সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। এভাবে মানুষের ক্ষমতা এবং অক্ষমতার প্রকাশভঙ্গির মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির রূপরেখা চিহ্নিত হয়। মানুষ দলবদ্ধভাবে বাস করে। অর্থাৎ মানুষের সামাজিক একটি জীবন আছে, সংসারের একটি প্রেক্ষাপট আছে। সংসার, সমাজ, জাতি এবং দেশের একটি পরিচয় নিয়ে মানব সংস্কৃতির উদ্ভব এবং বিকাশ।

এই সংস্কৃতির অনুসন্ধান করতে হলে মানব জাতির অতীত অনুসন্ধান করা কর্তব্য। যেহেতু সংস্কৃতির মাধ্যমে মানব সমাজকে সুনির্দিষ্ট সমাজ গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায় সেজন্য সংস্কৃতির একটি আঞ্চলিক রূপরেখা আছে। এই আঞ্চলিক রূপরেখার মধ্যে ইতিহাস-পূর্ব অতীত আছে, ঐতিহাসিক সময়ের উন্মেষ আছে, ক্রমধারা আছে, বহিরাগত ভাবপ্রবাহের স্পর্শ আছে, বর্তমানের চিত্র আছে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আছে। এভাবেই আমরা একটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ভূ-মণ্ডল চিহ্নিত করে সংস্কৃতির ইতিহাস নির্মাণ করতে পারি। যে অঞ্চলের কথাই আমরা বলি না কেন সে অঞ্চলের সংস্কৃতির একটি বিবর্তন এবং ধারাপ্রবাহ আছে। ইতিহাস-পূর্ব যুগে যে স্বভাব প্রকাশিত ছিল, পরবর্তীতে সে স্বভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। আবার পরিবর্তিত স্বভাবের মধ্যে ক্রমশ বহির্বিশ্বের বিচিত্র কল্লোল এসে মিলিত হয়েছে। এভাবে দেখা যাবে যে কোনও সংস্কৃতির সীমিত রূপব্যঞ্জনা নেই। বর্তমানে সংস্কৃতির যে রূপরেখা পাই তা প্রাচীনকাল থেকে একক কোন প্রবৃত্তিকে বহন করে প্রকাশিত নয়। নানাবিধ উপায়ে এবং কারণে সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। একটা বিশেষ অঞ্চলে কোন এক মানবগোষ্ঠী কিছুকাল অবস্থান করে, পরে সেই অঞ্চলে এক নতুন সমাজ গঠিত হয়। এভাবে পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। এই পরিবর্তনের ফলে একটি অঞ্চলভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগ্রহ গড়ে ওঠে যা ক্রমশঃ আমরা আবিষ্কার করি। কোন একটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ভূ-দৃশ্য বহুকালের বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর দ্বারা রচিত হয়ে ওঠে। একটি মানবগোষ্ঠীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা অতীত সংস্কৃতির পুঞ্জিভূত কিছু উপাদান পাই এবং ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার সাহায্যে আমরা সংস্কৃতির ক্রমধারা এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বিবর্তনের ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারি। এভাবে একটি অঞ্চলের সংস্কৃতির ইতিহাস আমরা আবিষ্কার করি। যে কোন দেশের অথবা অঞ্চলের সংস্কৃতির একটি উৎস আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বিস্তারও আছে। বর্তমান সংস্কৃতির রূপরেখা নির্ধারণের জন্য এই উৎস সন্ধান করা একান্ত কর্তব্য। দেখা যাবে যে বিবিধ পরিবর্তন ঘটলেও যে কোন অঞ্চলের অথবা দেশের সংস্কৃতির একটি ধারাবাহিকতা থাকে। এই ধারাবাহিকতার রূপ আমাদের

www.pathagar.com

জানতে হবে। সংস্কৃতির একটি প্যাটার্ণ বা ভঙ্গি আছে। শুধুমাত্র বর্তমানকে বিশ্লেষণ করলে সেই প্যাটার্নকে আবিষ্কার করা যায় না। সেজন্য প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে আমরা অতীতকে খনন করি। প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যেই সংস্কৃতির উৎস এবং বিস্তার সংক্রান্ত নানাবিধ মূল্যবান তথ্য আমরা পেয়ে থাকি। খননকার্য চালিয়ে মাটির নীচ থেকে অট্টালিকা আবিষ্কৃত হয়েছে, দ্রব্যসামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বহুবিধ হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। আমরা অনুসন্ধান করে জানতে পারি অতীতে কোন বিশেষ পরিবেশে এগুলো নির্মিত হয়েছিল এবং কোন তাৎপর্যে এগুলো ব্যবহৃত হয়েছিল। যদিও প্রত্নতত্ত্বের অনেক অনুসন্ধান অনুমান-নির্ভর কিন্তু বর্তমানে আমরা বহুবিধ অনুমানের নিরিখে একটি সত্যের উদঘাটন প্রায় করে ফেলেছি। বৈজ্ঞানিকভাবে উদ্ধারকৃত বস্তুর কাল নিরূপণের ব্যবস্থা হয়েছে। ইংরেজিতে যাকে ডেটিং বলে, সেই কাল নিরূপণ প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাছে একটি বিরাট কৌশল। তারা একটি সংস্কৃতির উৎস এবং প্রসার কাল-নিরূপণের সাহায্য করে থাকেন। অতীতের অঞ্চল বিভাগ এবং বর্তমানের অঞ্চল বিভাগ এক নয়। অতীতের ভৌগোলিক সীমাবন্ধন সংকীর্ণ ছিল, কিন্তু বর্তমানে ভৌগোলিক সীমাবন্ধন অত্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বর্তমান সীমাবন্ধন অতীতকে কেন্দ্র করেই প্রসারিত এবং চিহ্নিত। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ভূ-মণ্ডল তার অতীতের উৎস থেকে উদ্ভূত এবং বিকশিত। এদেশের বর্তমান সীমাবন্ধনটিও অতীতের সীমাবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। সুতরাং এদেশের সংস্কৃতির ভৌগোলিক সীমাবন্ধন চিহ্নিতকরণ খুব বেশি অসুবিধার সৃষ্টি করে না। যদিও এক সময় বঙ্গ অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমারেখা তার নিজস্ব ত্রিসীমাকে অতিক্রম করে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এবং বঙ্গ অঞ্চলের সংস্কৃতি অন্যান্য অঞ্চলেও প্রভাব বিস্তার করেছিল, কিন্তু ক্রমশঃ ভাষাভিত্তিক গোত্রবদ্ধতায় এই সংস্কৃতির ভূ-খণ্ড সীমাবদ্ধ হয়। বর্তমানে বাংলাদেশকে সেই সীমাকরণের মধ্যে আবিষ্কার করছি।

আমরা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখতে পাব যে এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক উপাদানের উৎপত্তির একটি কাল এবং স্থান আছে, দ্বিতীয়তঃ এই সমস্ত উপাদানের বিকাশ এবং বিস্তৃতির সময়কাল এবং প্রকৃতি আছে। তৃতীয়তঃ এখানকার সংস্কৃতি বিকাশের প্রবৃত্তির মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতির বিস্তার আছে, চতুর্থতঃ এ অঞ্চলের সংস্কৃতির ভূ-দৃশ্যের একটি রূপরেখা এবং বৈশিষ্ট্য আছে। এভাবে এ অঞ্চলের সংস্কৃতির ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, কৃষি ও বিজ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

www.pathagar.com

মানুষ, সমাজ এবং সংস্কৃতি একই সঙ্গে বিকাশলাভ করে অর্থাৎ মানুষের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের এবং সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটতে থাকে। এরা একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এককভাবে কারোই উদ্ভব সম্ভবপর নয়। মানুষ সংস্কৃতিকে নির্মাণ করে এবং সংস্কৃতির উপাদানগুলিকে আহরণ করে। মানুষ প্রথমে সমাজে বাসের উপযুক্ত হয় এবং সংস্কৃতিকে ব্যবহার করতে শেখে। এখানে কিছুটা সীমাবদ্ধতা অবশ্যই বিদ্যমান। অর্থাৎ মানুষ সংস্কৃতির কতটা গ্রহণ করতে পারবে অথবা সংস্কৃতিকে কিভাবে নির্মাণ করতে পারবে তার উপরই নির্ভর করছে একটি সংস্কৃতির সমৃদ্ধি। মানুষ কর্মক্ষম হয় এবং সংস্কৃতিকে ব্যবহার করতে শেখে। এই ব্যবহারের ফলে মানুষ তার সমাজকে নির্মাণ করে এবং সমৃদ্ধ করে। আমরা আমাদের দেশের প্রাগৈতিহাসিক কালের সুস্পষ্ট ইতিহাস জানি না, কিন্তু এটা জানি যে এতদঞ্চলের মানুষ ভিন্নতর সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। আর্যরা ভারতবর্ষে আগমন করেছিল একটি নতুন সংস্কৃতি নিয়ে। সমগ্র উত্তর ভারত তাদের করায়ত্ত হয়েছিল। তাদের প্রভাব ও অহমিকায় ভারতবর্ষে একটি নতুন সংস্কৃতির জন্ম হয়েছিল। তারা আনুগত্যের আহ্বান জানিয়েছিল সকল জাতিকে এবং মানবগোষ্ঠীকে। যে জাতি তাদের এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা বঙ্গজাতি। এই প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে একটি দুর্দান্ত সাহস আমরা লক্ষ্য করি। আমাদের সংস্কৃতির উৎসমূলে বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেন তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল সে ইতিহাস আমাদের জানা নেই, তবে আমরা অনুভব করতে পারি যে আপন অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমাবন্ধনকে অক্ষুণ্ন রাখবার জন্য তারা নিজস্ব সত্তার মধ্যে নিমজ্জিত থাকতে চেয়েছিল; যার ফলে এ অঞ্চলের সমাজবন্ধন এবং ভাষার বিকাশ আর্যাবর্তের অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে ভিন্নতর হয়েছিল। এই ভিন্নতা সবসময় রক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি, কিন্তু যতটা সম্ভব আপন স্বকীয়তা বজায় রাখার চেষ্টায় এতদঞ্চলের মানুষ অনেকটা সফলকাম হয়েছিল।

একটি সংস্কৃতিতে বিবিধ প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। এই লক্ষণগুলি সৃষ্টি হয় সংস্কৃতির বিকাশের মাধমে। আর্যদের আগমনের সময়ে বঙ্গভূমির লোকেরা আপন সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকবার চেষ্টা করলেও পরবর্তিতে এ অঞ্চলের সংস্কৃতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। পালদের আমলে বঙ্গ-সংস্কৃতির ভূ-খণ্ড বিস্তৃতি লাভ করে। এই বিস্তারের ফলে ভৌগোলিক সীমারেখা ভেঙ্গে যায় এবং জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে এ অঞ্চলের সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা অর্জিত হতে থাকে। আমরা জানি মানুষের অর্জিত আচরণ সংস্কৃতির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ে একটি নতুন সংস্কৃতি জন্মলাভ করতে পারে। বঙ্গবাসীরা

www.pathagar.com

তিব্বতে গিয়েছে, ব্রহ্মদেশে গিয়েছে, উত্তর ও পশ্চিম ভারতে নিজেদের প্রভাব বলয় বিস্তার করেছে। এর সাহায্যে অন্য সংস্কৃতিকে তারা দিয়েছেও যেমন অনেক কিছু নিজেরাও অর্জন করেছে। এভাবে বলতে পারি বিভিন্ন প্রলক্ষণ সমন্বিত হয়ে সেই প্রাচীনকাল থেকে এ অঞ্চলের সংস্কৃতির রূপরেখা নির্মিত হয়েছিল। বিশেষ করে এতদঞ্চলের চিত্রকলার কথা এক্ষেত্রে আলোচনা করা যায়। বঙ্গের চিত্রকলার বিশেষ কতকগুলি প্রলক্ষণ ছিল। সেগুলো পশ্চিম ভারত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং উত্তরে নেপাল ও তিব্বতের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। এই ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই চিত্র পদ্ধতিতে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয় এবং নতুন অর্জিত কৌশলে ক্রমশঃ এর রূপের পরিবর্তন হতে থাকে। আমরা যদি এ চিত্রকলার রং-এর ব্যবহার এবং আকৃতির গঠনতত্ত্ব পরীক্ষা করি তাহলে দেখব যে প্রাথমিক রূপ থেকে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে এই চিত্রকলা নতুন শোভা ও প্রতাপের অধিকারী হয়েছে। এখানে বলবার কথা এই যে একটি সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির প্রবল গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে এটা সত্য কিন্তু আবার নিজেই যখন অন্য সংস্কৃতির দিকে প্রভাবিত হয় তখন তা নতুন নতুন প্রলক্ষণ অর্জন করে। প্রাচীনকালের বঙ্গসংস্কৃতিও নিজস্ব উৎসকে রক্ষা করেই বাইরের প্রভাবকে স্বকীয় করেছে এবং আপন সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ভাষা। মানুষের অনুভূতি এবং প্রতিক্রিয়া ভাষার সাহায্যে উন্মুক্ত হয়। যে পরিবেশে মানুষ বাস করে সে পরিবেশ প্রতিনিয়ত তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এই প্রতিক্রিয়া ভাষা এবং উচ্চারণের মাধ্যমে বিকাশলাভ করে। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে একটি অঞ্চলের সংস্কৃতি সে অঞ্চলের ভাষার প্রকৃতিতে প্রভাব বিস্তার করে। এভাবে আমরা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতির একটা ইন্টারিলেশন বা পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজে পাই। ভাষা একই সঙ্গে দুটি দায়িত্ব পালন করে– ভাষা যেমন মানুষের অভিজ্ঞতাকে বহন করে এবং অভিজ্ঞতার বিভিন্ন উপকরণকে ধারণ করে আবার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিধর্মী প্রতীক ব্যঞ্জনা হিসেবে রূপলাভ করে অর্থাৎ ভাষাকে আমরা অভিজ্ঞতার সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকি। সংস্কৃতির উপকরণগুলো ভাষা বহন করে আবার সংস্কৃতিতে ভাষা নতুন নতুন চৈতন্য দান করে। বিখ্যাত ভাষাবিদ এডওয়ার্ড সাপির ভাষাকে এই দুটি প্রযুক্তিতে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। ভাষার সঙ্গে মানুষের পারসেপশন বা অনুভূতির নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। এই পারসেপশনগুলো কর্মভিত্তিক এবং উপকরণভিত্তিক। জীবন ক্ষেত্রে যে উপকরণগুলো থাকে এবং কর্মের দায়ভাগ থাকে সেগুলোকে স্পর্শ করেই একটি ভাষা সজীব এবং সক্রিয় হয়। বাংলা ভাষার আদি কবি সরহপার ভাষা পরীক্ষা

www.pathagar.com

করলে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলবে। সরহপা পূর্বী অপভ্রংশে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। সেই কাব্যের মধ্যে আমরা তৎকালীন মানুষের আচার-নিষ্ঠার পরিচয় পাই, কুসংস্কারের পরিচয় পাই, জীবন-যাপনের বিভিন্ন উপকরণের সন্ধান পাই, আবার বিভিন্ন আদর্শের বিস্তার পাই। সব কিছু মিলে সরহপার ভাষা তার সময়কালের বঙ্গ-সংস্কৃতির চিহ্ন ধারণ করে আছে। সরহপা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং প্রথাগত ধর্মার্চনারও বিরোধী ছিলেন। তিনি সতত মানবতার সেবায় উন্মুখ ছিলেন। সরহপার বিচারে মানুষের একমাত্র পরিচয় তার মনুষ্যত্বের দ্বারা। সরহপা আরো বলেছেন যে একটি জীবনে কোন কিছুই হারায় না। যেমন, নদীর পানি বাষ্প হয়ে মেঘ হয়, আবার বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে, তেমনি মানুষের জীবনের কর্মকাণ্ড মানুষকে নিয়েই। এখানে কোন বিচ্যুতি এবং অপলাপ নেই। বৌদ্ধ ধর্মের বিনয়, সান্ত্বনা এবং ত্যাগ তাকে প্রভাবিত করেছিল এবং এভাবে আমরা সংস্কৃতির মধ্যে ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করি। সরহপা যে সমাজের বিবরণ দিয়েছেন সে সমাজে জাতিভেদ ছিল, কুসংস্কার ছিল, কিন্তু সরহপা এগুলোর মূলোচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন। তিনি কোন ধর্মের প্রবর্তনের কথা বলেননি কিন্তু আচরণের সহিষ্ণুতার কথা বলেছেন। পরবর্তীতে বঙ্গভূমিতে বৈষ্ণব মতবাদ এবং সুফী মতবাদ যে প্রাধান্য পেয়েছিল তার পশ্চাতে সরহপার চিন্তা এবং ভাবনা কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল।

আমাদের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন যে এদেশের মানুষের নীতিবাদ এবং ধর্ম বিশ্বাসের পশ্চাতে কোন আদর্শ সক্রিয় ছিল। যুগ যুগ ধরে যে সহনশীলতা এখানকার ধর্ম আচরণের মূলে কাজ করেছে তার মধ্যে তিনটি বিশ্বাসই প্রধান–একটি হচ্ছে বৌদ্ধধর্মের সংক্ষুব্ধতাহীন আত্মনির্ভরতা, বিনয় এবং ত্যাগ, দ্বিতীয়ত বৈষ্ণবীয় প্রেম এবং অহমিকাশূন্য আত্মনিবেদন, তৃতীয়তঃ ইসলামের সুফী সাধনার স্বার্থহীনতা, প্রেম, আত্মত্যাগ এবং সমন্বয়বাদ। এটা সত্য, বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিকাশের একটি পর্যায়ে বহিরাগত সেন রাজাদের একটি নিষ্ঠুর অহমিকা সংক্ষুব্ধ আগন্তুক হিসেবে এ অঞ্চলের সমাজব্যবস্থা বিনষ্ট করতে চেয়েছিল, কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে ইখতিয়ারউদ্দীন বখ্‌তিয়ার খিলজির আগমনের ফলে সেনদের প্রভাব প্রশমিত হয় এবং একটি নতুন সংস্কৃতির সম্ভার আমরা অর্জন করি। সেনদের আমলে সংস্কৃতি ছিল এতদঞ্চলের মানুষের উপর শাসনের প্রভাবে আরোপিত একটি সংস্কৃতি। সেনরা এদেশে শ্রেণীভেদ প্রথা নতুন করে প্রবর্তন করেন, অপভ্রংশের পরিবর্তে সংস্কৃতকে নতুন ভাষা হিসেবে প্রচলিত করেন এবং উপাসনার জন্য নতুন স্থাপত্যরীতির গৃহ নির্মাণ করেন। এগুলো এদেশের মৌল বিবেচনা এবং কাঠামোকে আঘাত করেছিল;

www.pathagar.com

কিন্তু তাই বলে এগুলো যে সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে তা বলা যায় না। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে আরোপিত সংস্কৃতিও মানুষ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অর্জন করতে থাকে এবং তার প্রলক্ষণগুলো সংস্কৃতির মধ্যে আবিষ্কার করা যায়।

সংস্কৃতির একটি পরিচয় পাওয়া যায় স্থাপত্যশিল্পে এবং গৃহ-নির্মাণ প্রকল্পে। পালদের আমলে স্থাপত্যের নিদর্শন ছিল বৌদ্ধবিহার এবং স্তূপ। এগুলোর গঠনপ্রণালীর দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে। বৌদ্ধরা নিঃসংশয়বাদী, সংসারত্যাগী এবং নির্জনতাপ্রিয়। সুতরাং তাদের সাধনক্ষেত্রের সঙ্গে কোলাহল মুখরিত পৃথিবীর কোন সম্পর্ক নেই। তারা যে সমস্ত বিহার, চৈত্য এবং স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন সেগুলোর গঠন পদ্ধতি এমন ছিল যে বাইরের আলো-বাতাস সেখানে প্রবেশ করতে পারতো না। তাদের জীবন দর্শন একথা বিজ্ঞাপিত করতো যে ধর্মসাধনা বাস্তব পৃথিবী বিবর্জিত। সুতরাং পৃথিবীর কোলাহল এই সাধনায় যেন বিঘ্ন উৎপাদন না করে। হিন্দুদের মন্দিরের ক্ষেত্রে কিছুটা উন্মুক্ততা থাকলেও গর্ভগৃহের কিছুটা অবরুদ্ধতা ছিল, তবে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের কল্লোলে বাইরের মানুষকে আকর্ষণ করবার একটি ব্যবস্থা ছিল। বখতিয়ার খিলজীর আগমনের পর এদেশে নতুন স্থাপত্য রীতির প্রবর্তন হয়। এক প্রকার উন্মুক্ততা স্থাপত্য রীতির নির্দেশনায় ব্যবহৃত হতে থাকে। মসজিদের মধ্যে বাইরের আলো-বাতাসকে প্রবাহমান রাখা একটি সামাজিক এবং ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা– এই উন্মুক্ততার কারণে আবরিত স্থান উন্মুক্ত স্থানের সঙ্গে সমন্বিত হচ্ছে এবং বাইরের উন্মুক্ততা অভ্যন্তরের অংশকে উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান করছে। নতুন রীতির স্থাপত্য এভাবে গঠিত হলেও পাল ও সেন আমলের নিরুদ্ধভঙ্গী একেবারে অন্তর্হিত হয়নি। এখানে আমরা মৌলিক রীতির সঙ্গে অর্জিত রীতির মিশ্রণ দেখি এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নতুন প্রলক্ষণের সংযোজন লক্ষ্য করি। আধুনিক কালে অবশ্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার দিক লক্ষ্য রেখে স্থাপত্যরীতির পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। কোন কোন স্থাপত্যরীতি পুরোপুরি ব্যবহারিক। এক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনার প্রয়োজন যে আমাদের নিজস্ব স্থাপত্যরীতি কোন্‌টি এবং কিভাবে তা আধুনিক ব্যবহারিক রীতির সঙ্গে সমন্বিত হতে পারে।

সঙ্গীত এবং নৃত্যের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির প্রকাশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মানুষের ইচ্ছা ও আনন্দের সংকল্পকে সঙ্গীত ও নৃত্য বহন করে থাকে। প্রাচীন অতীত থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত এ উভয়বিদ শিল্প মাধ্যম আমাদের সংস্কৃতিকে ধারণ ও পোষণ করছে। এর ইতিহাস পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়নি। এই উপমহাদেশের সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে সঙ্গীত এবং নৃত্যের যে রূপরেখা বিদ্যমান তার সঙ্গে এতদঞ্চলের সঙ্গীত এবং নৃত্যের পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যকে স্মরণে রেখে এখানকার সঙ্গীত এবং নৃত্যের যথার্থ ভাবপ্রকল্পের

www.pathagar.com

উন্মোচন প্রয়োজন। দেখা যায় যে সরহপার সময় তার দোহাগুলো বিশেষ ভঙ্গিতে গীত হত। কিছু কিছু রাগ-রাগিণীর উল্লেখ সে সমস্ত দোহায় আছে। সমসাময়িক কালে এবং কিছুটা অব্যবহিত পরে চর্যাগীতিকায় বিভিন্ন রাগের অনুশীলন পাওয়া যায়। চর্যাগীতিকায় নৃত্যেরও উল্লেখ আছে। এগুলো কতটা ভারতীয় মার্গসঙ্গীত এবং নৃত্যের সহগামী অথবা পৃথক তা নির্ধারণ করা আমাদের কর্তব্য এবং নির্ধারিত হলে এগুলোর চর্চা এবং অনুশীলনের কি ব্যবস্থা হবে তারও নির্দেশনা প্রয়োজন। আধুনিককালে বর্তমানতার শাসনে সঙ্গীত এবং নৃত্যের ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রবৃত্তি জন্মলাভ করেছে সেগুলো কতটা সমীচীন এবং সমর্থনযোগ্য তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। আমরা লক্ষ্য করি যে পৃথিবীতে সর্বদাই সাময়িকতার প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়। এগুলো অধিকাংশ সময়ই হারিয়ে যায়। কিন্তু কখনো কখনো মোহগ্রস্ত হয়ে আমরা এগুলো আঁকড়ে রাখবার চেষ্টা করি। একটি জাতির সংস্কৃতির দিক-নির্দেশনার ক্ষেত্রে এই আধুনিকীকরণকে কতটা সমর্থনযোগ্য বিবেচনা করা যায় তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। আমাদের ধ্রুপদী সঙ্গীত এবং নৃত্য কোন স্বভাবের এবং তাৎপর্যের তা নির্ধারণ করা যেমন প্রয়োজন তেমনি এগুলোর প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলনের ব্যবস্থাপনার রূপ ও রীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

লোকসংস্কৃতি আমাদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক সভ্যতার প্রতাপে এবং শাসনে লোকসংস্কৃতি ক্রমশঃ অন্তর্হিত হচ্ছে। এজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লোকসংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে। সুইডেন এবং নরওয়ে, জার্মানী, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সকলেই চেষ্টা করছে আপনাপন দেশের লোকসংস্কৃতি আবিষ্কারের জন্য এবং সংরক্ষণের জন্য। বিভিন্ন দেশে লোকসংস্কৃতির ভূগোল এবং অঞ্চল চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। আমাদের দেশে যদিও পাশ্চাত্যের অনুপাতে বিজ্ঞান এবং যন্ত্রের প্রতাপ খুব বেশি নয় তবু কালক্রমে আধুনিকীকরণের প্রয়াসে আমাদের লোকসংস্কৃতিও ক্রমশঃ হারিয়ে যেতে বসেছে। এক্ষেত্রে আমাদের সংস্কৃতির রূপরেখা নির্ধারণের জন্য লোকসংস্কৃতি বিষয়ে প্রচুর গবেষণা এবং অনুসন্ধানের প্রয়োজন। মানুষের খাদ্য স্বভাব, খাদ্য আহরণ, কৃষি, বনভূমি সংরক্ষণ, নদী এবং মানুষের সঙ্গে নদীর সম্পর্ক, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সংস্কার এগুলো নিয়ে আমাদের লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। সুতরাং লোকসংস্কৃতি অনুসন্ধানের সাহায্যে আমরা একটি জাতির চৈতন্যকে উদঘাটন করতে পারি। বর্তমানে লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং প্রচারের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থাপনা আছে তা কতদূর শক্তিশালী এটা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এ সমস্ত ক্ষেত্রে নতুন কি কি ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা কর্তব্য তাও আমাদের চিন্তা করতে হবে। একটি জাতি তার জনসমষ্টিকে নিয়েই বেঁচে থাকে

www.pathagar.com

এবং জনসমষ্টির জীবনযাপনের এবং আনন্দ উৎসবের উপকরণগুলো ক্রমশ স্খলিত হয়ে যাক তা আমরা চাই না। জনসাধারণকে গ্রহণ করে একটি মানবগোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিকাশ এবং বিস্তার। আমাদের সংস্কৃতির যথার্থ রূপরেখা নির্ধারণকল্পে আমাদের লোকসংস্কৃতির অনুসন্ধান করা কর্তব্য এবং আধুনিক সমাজ জীবনের মধ্যে এ সংস্কৃতির ধারাপ্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখা কর্তব্য।

প্রত্নসম্পদ তথা সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের সাহায্যে আমরা একটি জাতির ইতিহাসকে যেমন ধারণ করি তেমনি ঐতিহাসিক বিবেচনাকে নতুন মূল্যমান দিয়ে থাকি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য যাদুঘর সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এক্ষেত্রে মিসরের প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া এবং যাদুঘরের কাহিনী বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচ্য। মিসরের একটি বিরাট অতীত আছে, সে অতীতের অনুসন্ধান নিয়ে খননকার্য নিত্যই চলছে। সে অতীত এত দীর্ঘ অতীত যে, বর্তমানকালের আঘাতে তাকে কোনক্রমেই নিশ্চিহ্ন করা যায় না। মিসরীয় সভ্যতা তার অতীতকে গ্রহণ করেই সমৃদ্ধ-বিপুল এবং অবক্ষয়হীন। বর্তমানকাল অতীতকে প্রবলভাবে ধরে রেখেছে এবং তাকে একটি সুনিশ্চয় প্রত্যয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমাদের দেশে এখনও প্রত্নতত্ত্ব এবং যাদুঘরের প্রতাপ পরিলক্ষিত হয় না। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। সেজন্য আমাদের সংস্কৃতির রূপরেখা নির্ধারণের জন্য প্রত্নানুসন্ধান বিষয়ে গভীর সমীক্ষা প্রয়োজন। কোন প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় এই কার্যধারায় গতিবেগ সঞ্চার করা যায় এবং কিভাবে এদের কার্যপ্রণালীর দুর্বলতা দূর করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া দেশে বিভিন্ন যাদুঘর গড়ে তোলা এবং সেগুলোকে সমন্বিত প্রশাসনের মধ্যে নিয়ে আসা একান্ত কর্তব্য। যাদুঘর একটি জাতির ইতিহাসকে ধারণ করে এবং শ্লাঘার কারণ হিসাবে সকল বিশ্বকে প্রদর্শন করায়। এক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়োজন এবং ভাব ও সম্পদ বিনিময়ের মাধ্যমে আমাদের যাদুঘরকে সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন। যাদুঘর বিকাশের বিভিন্ন দিক আছে। এ সমস্ত দিকের প্রতি আমাদের লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। কি বিন্যাসে এক একটি যাদুঘর গড়ে উঠবে সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন।

সংস্কৃতিকে শাসন এবং পরিবর্তন করে মানুষের কর্মদক্ষতা। এই কর্মদক্ষতা আবার নির্ভর করে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উপর। মানুষ যে প্রকৃতির উপর তার নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করে চলেছে তার সাহায্যে সে তার পরিবর্তন সাধন অব্যাহত রেখেছে। আদি মানুষ তার কর্ম সম্পাদনের একমাত্র উপকরণ হিসাবে পেয়েছিল প্রস্তর ও শিলাখণ্ড। সুতরাং সেই আদিমকালে তার বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ছিল প্রস্তরভিত্তিক। তাই আমরা মানব সংস্কৃতির প্রাথমিক ধারায় প্রস্তর যুগকে পাই।

www.pathagar.com

প্রস্তর যুগের মানুষ তার যন্ত্রপাতি হিসেবে যা কিছু নির্মাণ করেছে তার অধিকাংশই সে প্রস্তর ও শিলাখণ্ড দ্বারা নির্মাণ করেছে। অবশ্য হাড়ের ব্যবহারেরও প্রচলন ছিল। হরিণের সিং, হাতীর দাঁত এবং পশুর হাড় তারা ব্যবহার করতো। এভাবে আদি মানুষের সংস্কৃতি তৎসময়ের বিজ্ঞানের দ্বারা শাসিত হয়েছে। এ সংস্কৃতির একটি প্রাচীনতম যুগ আছে। যাকে আমরা প্রাচীন প্রস্তর যুগ বলে থাকি এবং পরবর্তী একটি যুগ আছে যাকে নব্যপ্রস্তর যুগ বলা হয়। এরপরে ক্রমশঃ তাম্র, ব্রোঞ্জ ও লৌহযুগ এসেছে। এই ইতিহাস সকলেরই জানা, আধুনিককালে বিজ্ঞান ও প্রাযুক্তিক উন্নয়নের ফলে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষ করে কৃষিপ্রধান দেশগুলোতে কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ একটি কৃষি বিপ্লবের সূচনা করেছে। আমাদের দেশ প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির মত বিশেষ উন্নতিলাভ করতে পারেনি তবুও স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞান এসে উপস্থিত হয়েছে এবং তার সাহায্যে আমাদের জীবনধারার পরিবর্তন ঘটছে। সংস্কৃতির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কতটা কার্যকর ভূমিকা পালন করছে তা অনুসন্ধান করা আমাদের কর্তব্য এবং অনুসন্ধানের সাহায্যে আমরা আমাদের সংস্কৃতির নতুন রূপরেখা নির্ণয় করতে সক্ষম হব।

শস্য উৎপাদনের মধ্যে মানব সংস্কৃতির একটি বিশেষ বিকাশ আমরা লক্ষ্য করি। যে মানুষ আদিকালে বন্যপশু শিকার করে খাদ্য সংগ্রহ করতো সেই মানুষ ক্রমশঃ পরিকল্পিত উপায়ে শস্য উৎপাদনের জ্ঞান অর্জন করে। এ ঘটনা একদিনে ঘটেনি, বহু বছরের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মানুষ শস্যের ব্যবহার সুনিশ্চিত করেছে এবং কিছু কিছু পশুকে গৃহপালিত করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানবগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে শস্য উৎপাদন করেছে, বর্তমানে শস্য উৎপাদনের সকল জ্ঞানই মানুষের জানা, এক্ষেত্রে পার্থক্য সূচিত হয় শুধুমাত্র জমির আয়তন, আর্দ্রতা এবং উর্বরতার উপর। বর্তমানে আমাদের দেশে খাদ্যশস্য সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য বিদেশী প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সমস্ত প্রযুক্তির ব্যবহারে এবং অনুশাসনে মানুষের জীবনধারার পরিবর্তন ঘটছে এবং চিন্তাধারারও পরিবর্তন ঘটছে। একসময় কৃষিকে কেন্দ্র করে যেসব উৎসব অনুষ্ঠিত হত আজকের দিনে সে উৎসবগুলি অবিকল আগের মত নেই। দ্বিতীয়তঃ নগরের নিকটস্থ অনেক গ্রাম নাগরিক রীতিনীতিতে পরিকীর্ণ হয়েছে। তার ফলে শস্যভিত্তিক যে উৎসবগুলো আগে ছিল সেগুলো এখন আর নেই অথবা এগুলোর পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের অনুসন্ধান করে জানতে হবে আমাদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসবের উৎসভূমি কোথায় এবং বর্তমানে তাদের স্বরূপই বা কি। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবের কর্মধারা পরিচালিত হয় সেই সব প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক দক্ষতা কতটুকু তাও নির্ণয় করা

www.pathagar.com

দরকার। এছাড়া উৎসবগুলো যাতে হারিয়ে না যায় এবং সুশৃংখল আবহে বর্তমান সময়েও বিকশিত থাকতে পারে সেই চেষ্টা করাও আমাদের কর্তব্য।

কৃষির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামীণ জীবনের এবং গ্রামীণ সংস্কারের পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রামের পথঘাট, জলাশয়, বৃক্ষরোপণ এবং গৃহ নির্মাণে এগুলোর পরিবর্তন হয়েছে। নাগরিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে গ্রামীণ জীবনেও পরিবর্তন এসেছে। একদিকে যেমন নগরবিপ্লব হচ্ছে এবং নগরায়ণ ঘটছে, তেমনি নগরের প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান গ্রামেও প্রবেশ করছে। পাশ্চাত্য দেশে এ পরিবর্তনটি যেভাবে হয়েছে আমাদের দেশে অবিকল সেভাবে হচ্ছে না। পাশ্চাত্য দেশে গ্রামের কোন আদিম ধারণা নেই। তাদের জীবনটা নগরভিত্তিক এবং গ্রামগুলি নগরেরই প্রত্যন্ত এবং প্রসারিত অঞ্চল মাত্র। সেসব দেশের সমস্যা হচ্ছে অতীতের রীতিনীতি এবং ব্যবস্থাপনাকে আবিষ্কার করা, আমাদের দেশের সমস্যা হচ্ছে পরিবর্তন সত্ত্বেও গ্রামীণ জীবনধারা ও জীবনদর্শনকে সংরক্ষণ করা। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি নানাভাবে সাহায্য করতে পারে। যেমন, নগরের গৃহনির্মাণ প্রকল্প এবং গ্রামের গৃহনির্মাণ প্রকল্প একরকম হবে না, তেমনি নগরের বৃক্ষরোপণ এবং গ্রামের বনায়ন একরকম হবে না। আরো অধিক বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে নগরের পথঘাটের ব্যবহার এবং গ্রামের পথঘাটের ব্যবহার, নগরের পানির ব্যবহার এবং গ্রামের পানির ব্যবহার এক রকম নয়। প্রযুক্তির সাহায্যে আমরা এই পার্থক্যগুলিকে সুন্দরভাবে বিকশিত করতে পারি এবং উভয় অঞ্চলের জীবনকে স্ব-স্ব অঞ্চলের মানুষের জন্য স্বাভাবিক করে গড়ে তুলতে পারি।

পাশ্চাত্যের প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান অনেক সময় জীবনধারায় বিঘ্ন উৎপাদন করেছে, এ বিঘ্ন কেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। অনেক সময় বিদেশের প্রযুক্তি আমাদের স্বভাবের এবং আদর্শের বিরোধী হতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমাদের প্রয়োজনকে চিহ্নিত করা এবং সেইসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রাযুক্তিক ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করা।

মানবজাতি যে হিসেবে জাতি হিসাবে চিহ্নিত তাকে ইংরেজিতে বলা হয় স্পেসিস অর্থাৎ প্রজাতি। কিন্তু এই মানব প্রজাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের পার্থক্য দেখা যায়–রং এর পার্থক্য, শরীরী গঠনের পার্থক্য এবং আকৃতির পার্থক্য। এই পার্থক্যের ভিত্তিতে পৃথিবীতে মানুষকে বিভিন্ন বর্ণ-গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এই সমস্ত বর্ণগোষ্ঠী কেন গড়ে উঠেছে তার নানাবিধ কারণ আছে, এই কারণগুলির কোনটা ভৌগোলিক আবার কোনটা বংশগত। মানুষের গায়ের রং, চুলের আকৃতি, নাসিকার গঠন–এ সমস্ত শারীরিক বৈশিষ্ট্য মানুষ বংশানুক্রমে

www.pathagar.com

লাভ করে থাকে। বংশগতভাবে যে উপকরণটি পিতা থেকে সন্তানে বাহিত হয় সে উপকরণটিকে 'জীন' বলে। মানবজাতির বর্ণ-গোষ্ঠীর উৎপত্তিতে এই জীনের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মানুষ সুনির্দিষ্ট কোন বর্ণ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এখানে বহু জাতির মিশ্রণ রয়েছে। আদিম যে সম্প্রদায় এখানে ছিল তাদের সঙ্গে আর্যদের মিশ্রণ ঘটেছে, সেমিটিক গোষ্ঠীর মিশ্রণ ঘটেছে, ককেসীয়দের মিশ্রণ ঘটেছে, মঙ্গোলীয়দের মিশ্রণ ঘটেছে এবং এভাবে বহুবিধ জাতির মিশ্রণে বাঙ্গালী জাতিসত্তার সৃষ্টি। পৃথিবীতে কোন জাতিরই স্থায়ী কোন রূপ নেই। আমরা যেহেতু সতত পরিবর্তনশীলতার মধ্যে বাস করি সুতরাং সেক্ষেত্রে অপরিবর্তনশীল কোন গোত্রই কল্পনা করা যায় না। বাংলাদেশে তো নয়ই, এখানকার মানুষের মধ্যে বর্ণগত, আকৃতি ও গঠনগত বিস্ময়কর পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং সুস্পষ্টভাবে কোনও বিশেষ প্রকৃতিবিশিষ্ট একটি রেস বা বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করে বাঙ্গালী হিসেবে কোন সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট জাতিসত্তা কল্পনা করা সম্ভবপর নয়। তাই কোনও মৌলিক নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যভিত্তিক বাঙ্গালী নরগোষ্ঠী চিহ্নিত করা যায়না। বাঙ্গালী বলতে আমরা বুঝি মূলতঃ বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠী। কখনও কখনও বিতর্ক উত্থাপিত হয় এই জাতিতত্ত্ব নিয়ে, এই বিতর্কের সুযোগ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে খুব বেশি নেই। তাছাড়া বর্তমানকালে ভৌগোলিক সীমাবন্ধন জাতি নির্ণয়ের পক্ষে একটি নতুন যাত্রা সংযোজন করেছে। বর্তমানে ভৌগোলিক প্রত্যয় জাতিসত্তা নির্ধারণের একটি নতুন বিকল্প হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

মানুষের বেঁচে থাকবার প্রেরণা থেকেই মানুষের স্বাভাবিক কতকগুলো প্রয়োজন জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে গড়ে ওঠে। এই প্রয়োজনগুলো হচ্ছে খাদ্য, আশ্রয়, প্রজনন, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সহযোগিতা। এটাই সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয়তা যা পৃথিবীর সর্বক্ষেত্রে সমান। এই প্রয়োজনীয়তা সম্পাদনের জন্য মানুষ সংস্কৃতিকে তার উপায় হিসেবে বেছে নেয়। অর্থাৎ প্রতিটি প্রয়োজনের জন্য চিন্তা, পরীক্ষা এবং কর্মসাধনা আছে। এই চিন্তা পরীক্ষা এবং কর্মসাধনার ক্ষেত্রেই জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে সাংস্কৃতিক বিভাজন গড়ে উঠেছে। একটি উদাহরণ দিলে কথাটি স্পষ্ট হবে। পৃথিবীর সকল মানুষই খাদ্য গ্রহণ করে এবং এক্ষেত্রে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু বিবিধ প্রকার খাদ্য বিভিন্ন আকারে মানুষ গ্রহণ করে থাকে এবং খাদ্য প্রস্তুতকরণ এবং পরিবেশন প্রক্রিয়ার দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য গড়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়াটি সংস্কৃতির অঙ্গ। খাদ্য গ্রহণটা সর্বজনীন, কিন্তু খাদ্য গ্রহণের উপায় এবং পদ্ধতিটা একেকটি সংস্কৃতির অঙ্গ। এই পদ্ধতি কখনও সর্বজনীন নয়। তেমনি আশ্রয়ের প্রয়োজন সর্বজনীন। আমরা আশ্রয় চেয়ে থাকি বৃষ্টি থেকে, বরফ থেকে, শীত থেকে, বাতাস থেকে

www.pathagar.com

এবং সূর্য থেকে। কিন্তু আশ্রয় নির্মাণ পদ্ধতিটা একেক অঞ্চলে একেক রকম। উপকরণের ব্যবহারে এবং আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যের কারণে আশ্রয়স্থলে পরিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবীর সকল অঞ্চলের মানুষ এক ধরনের আশ্রয় নির্মাণ করে না। এই আশ্রয় নির্মাণের মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে এবং সাংস্কৃতিক উপকরণ হিসেবে এবং বিশেষ ধরনের সাংস্কৃতিক পার্থক্য হিসেবে এই আশ্রয় নির্মাণটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই কারণে গৃহনির্মাণ এবং স্থাপত্যরীতি সংস্কৃতির একটি অঙ্গ। বর্তমানে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য স্থাপত্য রীতি প্রচলিত হতে চলেছে। এই রীতি আমাদের ব্যবহার-উপযোগিতা, জীবন-ধারণ পদ্ধতি এবং আবহাওয়ার ক্ষেত্রে কতটা সমীচীন তা বিবেচনা করা কর্তব্য। আমাদের গৃহনির্মাণ প্রকল্পে একটি সুনির্দিষ্ট দেশগত সাংস্কৃতিক রূপরেখা অভিব্যক্ত হবে এটাই আমরা কামনা করি।

আমরা আমাদের আলোচনায় দেখেছি, বৈদিক আর্যদের সময়ে যে অঞ্চল নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশ সে অঞ্চলের সঙ্গে আর্যদের কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। বৈদিক সূত্রে এ অঞ্চলের উল্লেখ নেই 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' এ অঞ্চলের লোকদের 'অনার্য এবং দস্যু' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' পুন্ড্র বলে একটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। এই পুন্ড্র ছিল উত্তরবঙ্গের নাম। তেমনি 'ঐতরেয় অরণ্যকে' এ অঞ্চলের লোকদের সম্পর্কে নিন্দাসূচক উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগের শেষে রচিত 'বৌধায়ন ধর্মসূত্রে' পুন্ড্র এবং বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে যেখানে বলা হয়েছে যে আর্যরা ওসব অঞ্চলে গেলে তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বৈদিক যুগের এ সমস্ত শাস্ত্রীয় উল্লেখের সাহায্যে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বঙ্গদেশ আর্য প্রভাবের বাইরে ছিল। স্থানীয় লোকেরা তাদের নিজস্ব সত্তা নিয়ে বহিরাগত আর্যদের আক্রমণ প্রতিহত করেছে কিন্তু যেহেতু আর্যরা সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ভারতের সর্বত্র অগ্রসর হয়েছিল। সুতরাং এ অঞ্চলের লোকেরা আর্যদের সঙ্গে সর্বদাই সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতো। পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর ভারতের আর্যগণ বহুবার এ অঞ্চলকে করায়ত্ত করতে চেয়েছে। কখনও কখনও সফলকামও হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘর্য়কাল ধরে রাখতে পারেনি। সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে বঙ্গ অঞ্চলের আদিম অধিবাসীগণ আর্যজাতীয় ছিলেন না। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র সেন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণ বাংলা ভাষার রূপকল্প-বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে আর্যগণ এদেশে আসবার পূর্বেই বিভিন্ন জাতি এদেশে বসবাস করতো, তার স্বাক্ষর বর্তমান বাংলা ভাষাতেও বিদ্যমান। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো কোল, মুণ্ডা, শবর পুলিন্দ, আড়ী, ডোম প্রভৃতি যে সমস্ত জাতি দেখা যায় এরা

www.pathagar.com

সেই আদিম অধিবাসীদের বংশধর এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষায় মুণ্ডা প্রভাবের কথা বলেছেন। কালক্রমে এ অঞ্চলের তিব্বতী মোঙ্গলরা এসেছে, বর্মীরা এসেছে এবং সেমিটিক জাতিভুক্ত আরবরা এসেছে। সংস্কৃতি এবং ভাষার ক্ষেত্রে এ সমস্ত জাতি প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। চর্যাগীতিকা এবং সরহপার 'দোহাকোষে' শবর, ডোম, হাড়ী, চণ্ডাল এবং নিষাদ জাতীয় মানুষদের কথা আছে। অবশ্য ব্রাহ্মণদের কথাও আছে। সরহপার রচনায় ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপক কোন উক্তি নেই।

নৃতত্ত্বে মানুষের করোটির আকৃতি পরীক্ষা করে জাতি নির্ণয় করা যায়। এ পরীক্ষার ক্ষেত্রে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়, একটিকে বলে Dolichocephalic এবং অন্যটিকে Brachycephalic। প্রথমটির বাংলা করা যায় 'দীর্ঘ বলে এবং দ্বিতীয়টি 'খর্ব-শির'। প্রথমটির অর্থ হল এমন একটি করোটি যার প্রস্থ দৈর্ঘ্যের চার-পঞ্চমাংশ কম এবং পরেরটির অর্থ হল এমন একটি করোটি যার প্রস্থ দৈর্ঘ্যের অন্ততঃ চার-পঞ্চমাংশ। বাংলাদেশ তথা সমগ্র বঙ্গভূমির আদিম অধিবাসীরা 'খর্বশির' কিন্তু বৈদিক আর্যগণের প্রাধান্য ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলে ছিলো সেখানকার অধিবাসীরা দীর্ঘ-শির। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন যে মস্তিষ্কের গঠনপ্রণালী থেকে নৃতত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে বাঙালী একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট জাতি। এমন কি বাংলাদেশের ব্রাহ্মণের সঙ্গে ভারতের অপর কোনও প্রদেশের ব্রাহ্মণের চেয়ে বাংলার কায়স্থ সদ্‌গোপ, কৈবর্ত প্রভৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ।

কেউ কেউ দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির সম্পর্ক নির্ধারণের চেষ্টা পেয়েছেন। তাদের বক্তব্য হল যে, খৃষ্ট জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগের সিন্দুনদের উপত্যকায় এবং মধ্যভারত ও রাজস্থানের কিছু কিছু অঞ্চলে যেমন তাম্র যুগের সভ্যতা ছিল বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে সেই ধরনের মনুষ্যগোষ্ঠী বাস করতো। এরা চাষাবাদ করতো, নানা নক্‌শায় শোভিত মৃৎপাত্র ব্যবহার করতো, শম্বর নীল গাই প্রভৃতি পশু শিকার এবং শূকর পালন করতো। এখানকার সর্বপ্রাচীন অধিবাসীরা প্রস্তর ও তাম্র ধাতু ব্যবহার করতো এবং ক্রমান্বয়ে লোহার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় অজয় কুমুর এবং কোপাই নদীর তীরে ভূগর্ভ খননের ফলে প্রাচীন যুগের যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার উপর ভিত্তি করে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ করেছেন। তবে এই সিদ্ধান্তগুলো সর্বজনমান্য ও সম্মানিত হয়নি।

তবে একটি সত্য দিবা দ্বিপ্রহরের মত সুস্পষ্ট তা হচ্ছে, আর্যদের সঙ্গে বঙ্গ অঞ্চলের মানুষের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। তার প্রমাণ

www.pathagar.com

পাওয়া যায় বৈদিক ধর্মের অনেক নীতি এবং নির্দেশনা বঙ্গ অঞ্চলে অনুপস্থিত ছিল এবং অদ্যাবধি অনুপস্থিত। এই অঞ্চলে যে সমস্ত পূজাপ্রণালী বিভিন্ন আদিম জাতির মধ্যে চলে আসছে এবং আপামর হিন্দু সাধারণের মধ্যে প্রচলিত সেগুলো বৈদিক হোম ও যাগযজ্ঞের বিরোধী। বিভিন্ন লৌকিক ব্রত আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহে হলুদ, সিঁদুর প্রভৃতির ব্যবহার, ধূতি শাড়ি প্রভৃতি ব্যবহার বাঙালী জাতির নিজস্ব সত্তার পরিচয় বহন করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে গ্রামীণ ভূভাগের স্থানিক নাম বিশুদ্ধ আর্য নাম নয়। এ সমস্ত অঞ্চলের জনপদ নামের বিস্তারিত কোন আলোচনা হয়নি। আলোচনা হলে ধরা পড়তো যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতেও আর্য সভ্যতা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পূর্ণভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। নানা ধরনের গল্প এই বঙ্গ অঞ্চল সম্বন্ধে প্রাচীন মহাভারতে আছে। মহাভারতে বাংলাদেশের কয়েকটি রাজ্যের কথা আছে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন ঃ

"...মহাভারত রচনার যুগে–এমনকি তাহার পূর্ব হইতেই বাংলাদেশ অনেকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। কখনও কখনও কোন পরাক্রান্ত রাজা ইহার দুই তিনটি একত্র করিয়া বিশাল রাজ্য স্থাপন করিতেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের সহিতও বাংলার রাজগণের রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল এবং তাহাদের শৌর্য ও বীর্যের খ্যাতি বাংলার বাহিরেও বিস্তৃত ছিল।

"অঙ্গরাজ কর্ণের অধীনে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিকাংশ ভাগ মিলিয়া একটি বিশাল রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল– মহাভারতের এই উক্তি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলা কঠিন। কিন্তু খৃঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন যে বাংলাদেশে এইরূপ একটি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল, সমসাময়িক গ্রীক লেখকগণের বর্ণনা হইতে তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। গ্রীকগণ গন্ডরিডাই অথবা গঙ্গারিডই নামে যে এক পরাক্রান্ত জাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহারা যে বঙ্গদেশের অধিবাসী, তাহাতে কোন সন্দেহ নেই। কোন কোন লেখক গঙ্গানদীকে এই দেশের পূর্বসীমা এবং কেহ কেহ ইহাকে পশ্চিম সীমারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্লিনি বলেন, গঙ্গানদীর শেষভাগ এই রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই সমুদয় উক্তি হইতে পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গঙ্গানদীর যে দুইটি স্রোত এখন ভাগীরথী ও পদ্মা বলিয়া পরিচিত এই উভয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে গঙ্গারিডই জাতির বাসস্থান ছিল।

"এই গঙ্গারিডই জাতি, সম্বন্ধে একজন গ্রীক লিখিয়াছেন ঃ ভারতবর্ষে বঙ্গজাতির বাস। তন্মধ্যে গঙ্গারিডই জাতিই সর্বশ্রেষ্ঠ (অথবা সর্বপেক্ষা প্রভাবশালী) ইহাদের চারি সহস্র বৃহৎকায় সুসজ্জিত রণহস্তী আছে, এই জন্যই অপর কোন রাজা এই দেশ জয় করিতে পারেন নাই। স্বয়ং আলেকজান্ডারও এই সমুদয় হস্তীর বিবরণ শুনিয়া এই জাতিকে পরাস্ত করিবার দুরাশা ত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

"গ্রীকগণ প্রাসিয়য় নামক আর এক জাতির উল্লেখ করেন। ইহাদের রাজধানীর নাম পালিবোথরা (পাটলিপুত্র-বর্তমান পাটনা) এবং ইহারা গঙ্গারিডই দেশের পশ্চিমে বাস করিত। এই দুই জাতির পরস্পর সম্বন্ধ কি ছিল, গ্রীক লেখকগণ সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকাংশ প্রাচীন লেখকই বলিয়াছেন যে, এই দুইটি জাতিই গঙ্গারিডই এর রাজার অধীনে ছিল এবং তাহার রাজ্য পাঞ্জাবের অন্তর্গত বিপাশা নদীর তীর হইতে ভারতের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্লতর্ক একস্থলে এই দুই জাতিকে গঙ্গারিডই রাজার অধীন এবং আর এক স্থলে দুই জাতির পৃথক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন।

"অধিকাংশ গ্রীক লেখকের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া মোটের উপর এই সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন হইবে না, যে সময়ে আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, সেই সময়ে বাংলার রাজা মগধাদি দেশ জয় করিয়া পাঞ্জাব পর্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। গ্রীক ও লাতিন লেখকগণ এই রাজার যে নাম ও বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে অনেকেই অনুমান করেন যে, ইনি পাটলিপুত্রের নন্দবংশীয় কোন রাজা। ইহা সত্য হইলেও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে। কারণ নন্দরাজা বাংলা হইতে গিয়া পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করিবেন, ইহা অসম্ভব নহে। পরবর্তীকালে বাঙালী পাল রাজাগণও তাহাই করিয়াছিলেন। পুরাণে নন্দরাজবংশ শুদ্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ইহাও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে। কারণ বাংলাদেশ বহুকাল পর্যন্ত আর্যসভ্যতার বহির্ভূত ছিল এবং ইহার অধিবাসী আর্য ধর্মশাস্ত্র অনুসারে শুদ্র বলিয়া বিবেচিত হইবেন ইহাই খুব স্বাভাবিক।"

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এটা উপস্থিত করা যায় যে, বঙ্গ অঞ্চল অতীতে আপন স্বাতন্ত্র্যে এবং নিজস্ব সত্তায় বিদ্যমান থাকতে চেয়েছে এবং আর্যদের প্রতাপকে মান্য করেনি। মূলতঃ পাল রাজত্বের সময় থেকেই বাংলাদেশে নিজস্ব স্বাধীন সত্তা দীর্ঘকালের জন্য গড়ে ওঠে। পাল রাজ্যশাসন স্থাপিত হওয়ার পূর্বে বঙ্গাঞ্চলে সুস্থির প্রশাসনিক ব্যবস্থা সীমিত উদাহরণ ব্যতীত ছিল না বললেই চলে। একমাত্র পাল রাজত্বের আমলেই সুদীর্ঘ চার বছর একটি রাজ্যধারায় বঙ্গভূভাগ শাসিত হয়েছিল। এক পর্যায়ে পাল নৃপতিদের সমান্তরালভাবে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে প্রায় ১৫০ বছর স্থায়ী চন্দ্রবংশের নৃপতিদের অব্যাহত শাসনের কথা জানা যায়। এ অঞ্চলের প্রাচীন যুগের রাজা ও রাজবংশের নিম্নরূপ কাল বিজ্ঞাপন সূচী করা যায় ঃ

www.pathagar.com

৪র্থ ৫ম শতাব্দী	–গুপ্ত সাম্রাজ্য
৫ম শতাব্দী	–গোপচন্দ্র
	–ধর্মাদিত্য
	–সমাচারদেব
৬০০-৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দ	–শশাঙ্ক
৬৫০-৭০০ খ্রিষ্টাব্দ	–খড়গ ও রাতবংশ
৭৫০-১১৬০	–পালবংশ
৯০০-১০৫০ খ্রিষ্টাব্দ	–চন্দ্রবংশ
১০৭৫-১১৫০ খ্রিষ্টাব্দ	– ধর্মবংশ
১০৯৫-১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ	–সেনবংশ

বঙ্গের প্রথম প্রধান স্বাধীন নরপতি হিসাবে শশাঙ্কের নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। রমেশচন্দ্র মজুমদার শশাঙ্ককে বাঙ্গালী জনগণের মধ্যে প্রথম সার্বভৌম নরপতি বলে সাব্যস্ত করেছেন। আমরা জানি না শশাঙ্ক কোন বংশদ্ভূত ছিলেন এবং সত্যি বাঙ্গালী ছিলেন কি না। রমেশচন্দ্র মজুমদার স্বীকার করেছেন যে বঙ্গরাজ্য শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত ছিল কি না নিশ্চিত বলা যায় না। হিউ-য়েন-সাঙ এ বিবরণে পাওয়া যায় যে শশাঙ্কের মৃত্যুর পরপরই সমতল অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্যের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। যে রাজা সমতটে রাজত্ব করতেন তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ঐ রাজবংশের শীলভদ্র নামক একজন পন্ডিত হিউ-য়েন-সাঙ এর আগমনের সময় নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। বঙ্গ অঞ্চলে অন্য একটি রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত বংশের নাম খর্গ বংশ। এই খর্গ বংশের রাজগণ সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাদের রাজ্য দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে বিস্তৃত ছিল। অনুমান করা হয়ে থাকে যে তাদের রাজধানীর নাম ছিল কর্মান্ত। কর্মান্ত হচ্ছে বর্তমানে কুমিল্লার নিকটবর্তী রড় কামতা নামক একটি স্থান। সপ্তম শতকে বঙ্গ আঞ্চলে বহিরাগত আর্যদের আক্রমণ এবং অন্যবিধ বহিঃশত্রুর আগমনে বাংলার রাজতন্ত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। সমগ্র দেশে কোন স্থির শাসন ছিল না। এর ফলে লোকের দুঃখ দুর্দশার সীমা ছিল না। দেশে অরাজকতা ছিল প্রবল এবং দুর্বলের উপর অত্যাচার অনবরত হত। এই বিশৃংখল অবস্থা থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য বঙ্গদেশীয় জনসাধারণ যে বিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। দেশের প্রবীণ

www.pathagar.com

নেতাগণ স্থির করলেন যে, পরস্পর বিবাদ বিসংবাদ ভুলে তারা একজনকে রাজপদে নির্বাচন করবেন এবং সকলেই স্বেচ্ছায় তার শাসন মেনে নেবেন। দেশের জনসাধারণ এই সিদ্ধান্ত মেনে নিল। এর ফলে গোপাল নামক এক ব্যক্তি বাংলাদেশের রাজপদে নির্বাচিত হলেন। গোপালই প্রথম যথার্থ বঙ্গবাসী যিনি পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ঘটান এবং একটি স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের উদ্ভব ঘটে। এই পাল রাজবংশের সময়েই বাংলাদেশের ভাষা, সাহিত্য, চিত্রকলা ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের ব্যাপক উন্নতি ঘটে।

বাংলাদেশের অতীত নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন এজন্য যে প্রায় সকল আলোচনায় এই সময়কালটিকে অগ্রাহ্য করা হয় অথবা তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। আমরা দেখেছি যে, বাংলাদেশের অতীত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত এবং প্রজ্ঞাপিত। এরমধ্যে মোটামুটি তিনটি যুগ আমরা পাই–একটি হচ্ছে পালপূর্ব যুগ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে পালযুগ এবং তৃতীয়টি হচ্ছে সেনযুগ। অবশ্য পালযুগে চন্দ্রদের কথাও স্মরণে রাখতে হবে। বাংলার সংস্কৃতি নির্মাণে পালপূর্ব যুগের তেমন কোন ভূমিকা নেই, কেননা এ সময়ে দেশে বিশৃংখলা বিরাজমান ছিল এবং বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আর্যপ্রভাব অস্বীকারের প্রবণতা ছিল। আর্যরা জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন, স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন এবং গণতন্ত্রের অধিকার লুপ্ত করেছিলেন। আর্যদের সময়ের জাতিভেদ এ অঞ্চলে দানা বাঁধতে পারেনি। এদেশের মানুষ জাতি পরিবর্তনের এক বিস্ময়কর নমুনা রেখে গেছে। এ অঞ্চলের মানুষ ব্রাহ্মণ থেকে শুদ্র হয়েছে, আবার শুদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছে, ক্ষিতিমোহণ শাস্ত্রী তাঁর 'জাতিভেদ' গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, এ সমস্ত কারণে এ অঞ্চলের সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে পাল-পূর্ব যুগকে আমাদের বিবেচনায় আনা বিশেষ প্রয়োজন করে না।

পালযুগটি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়কালে জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধন ঘটে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়, গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন ঘোষিত হয়, বিস্ময়কর চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য অঞ্চলে গড়ে ওঠে, সর্বোপরি, বৌদ্ধ বিনয়, তৃষ্ণাহীনতা, সাম্য এবং সমতার একটি আদর্শ এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উপরে ছিল ভাষা। জনসাধারণের সহজাত আনন্দ এবং আগ্রহকে বহমান করবার জন্য একটি পূর্ব অপভ্রংশ এখানে গড়ে উঠেছিল। এই জনসাধারণের ভাষা এখানকার সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হয়েছিল। অর্থাৎ এক কথায় এ অঞ্চলের মানুষের মানসপ্রক্রিয়া গঠনের জন্য একটি মার্জিত রুচির সংস্কৃতি এখানে গড়ে উঠেছিল। ভাষা সংস্কৃতিকে ধারণ করে এবং তাকে বহমান এবং প্রকাশিত রাখে। এ সময়কার দোহা-বন্ধগুলো এবং গীত-বন্ধগুলো

www.pathagar.com

এখানকার সংস্কৃতিকে রূপ দিয়েছে এবং সজীব করেছে। বাংলাদেশের পরবর্তী কালের সংস্কৃতিকে অনুভব করতে হলে পাল রাজত্বকালের সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করতে হবে। চন্দ্রদের সময়েও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল।

পালদের পরে বহিরাগত সেনরা এসে এদেশকে নিজেদের অধিকারে রেখেছিল। খুব দীর্ঘকাল না হলেও প্রায় পঁচাত্তর বৎসর তারা এ অঞ্চল শাসন করেছিল। এখানকার মানুষকে স্বধর্মচ্যুত করবার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল এবং কর্ণাটক এবং কর্ণকুঞ্জ থেকে সংস্কৃতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ এনে এ অঞ্চলের সংস্কৃতির প্রকৃতিতে পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করেছে। অত্যন্ত নিষ্ঠুর আকারে জাতিভেদ প্রথা পরিবর্তন করে এবং বৌদ্ধদের উৎখাত করার চেষ্টায় সকল শক্তি নিয়োগ করে তারা যে কঠোরতার নিদর্শন রেখে গেছে তা বাংলা সংস্কৃতির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ ক্ষেত্রে যে প্রভাবটি প্রচণ্ড এবং প্রবলভাবে অভিব্যক্তি তা হচ্ছে, কবি জয়দেবের ললিতমধুর কাব্য 'গীতিগোবিন্দ'। জয়দেব শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিধারার মাঙ্গল্য গান রচনা করলেন এবং এর প্রভাব বাঙ্গালী জীবনে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। জয়দেবের সঙ্গীত পরবর্তীতে বৈষ্ণব সঙ্গীদের জন্ম দেয় এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাঙ্গালী সমাজ জীবনে তা সম্মোহন বিস্তার করে। নৃত্যের ক্ষেত্রে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতের 'ভরত নাট্যম' জয়দেবের সঙ্গীতের প্রেক্ষাপটে সমৃদ্ধি লাভ করে। এ সময়ের সংস্কৃতির চিত্রকে নিম্নরূপে চিহ্নিত করা যায় ঃ

রাজকাল	রাজনৈতিক অবস্থা	সংস্কৃতির পরিচয়
পাল-পূর্বযুগ	বিশৃঙ্খল অবস্থা	অস্থির
পাল ও চন্দ্র যুগ	স্থিতিশীলতা গণতন্ত্রায়ণ, লোকহিত	সাম্য, শান্তি ও বিনয়ের প্রতিষ্ঠা, চিত্রকলার উদ্ভব; সঙ্গীত ও নৃত্যের ব্যবহার; কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সাধন; ভাষা ও কাব্যের বিকাশ
সেন যুগ	বহিরাগত শাসন, স্বৈরতন্ত্র	উচ্চবিত্তের আসরে সংস্কৃত বিকাশ; সংস্কৃত ভাষার প্রভাব, নৃত্য সঙ্গীতের রাগানুগ ব্যবস্থা

অল্প সময়ের মধ্যে সেন রাজাদের শাসনে রাজদরবারের গৃহীত নীতি হিসাবে সংস্কৃত উচ্চবিত্তদের আসরে স্থান লাভ করে। রাজদরবারে সংস্কৃত ভাষার কবি, সঙ্গীতজ্ঞ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের স্থান হয় এবং রাজ আনুকূল্যে একটি সম্ভ্রান্ত এবং সচেতন সংস্কৃতি এদেশের উপর আরোপিত হয়। আরোপিত সংস্কৃতি হারিয়ে

www.pathagar.com

যাবার সম্ভাবনা থাকে বেশি কিন্তু হারিয়ে গেলেও কিছুটা রেশ যে রেখে যায় না তা নয়, একটি বিশেষ কারণে এই রেশ বিদ্যমান ছিল। জয়দেব যে সংস্কৃত ভাষায় তার কাব্য রচনা করেছিলেন তার ভঙ্গি ছিল সহজবোধ্য এবং আকর্ষণীয়। জয়দেবের কাব্যের ললিত তরলভঙ্গি জনসমাজে সম্মোহন সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। একে তো রাজ-আনুকূল্য এবং প্রচারণা বিদ্যমান ছিল, তদুপরি জয়দেবের নিজস্ব নাগরিক বৃত্তি এবং কৌশল তাকে জনসমর্থনের সুযোগ দিয়েছিল। তাঁর 'গীতগোবিন্দ'কে অবলম্বন করে এ অঞ্চলে ধ্রুপদী সঙ্গীত এবং নৃত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এগুলোর নির্দশন পরবর্তীতে হারিয়ে গেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এক সময় যে ছিল তা ধারণা করা যায়। জয়দেবের প্রভাব পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়েছিল, যেমন উড়িষ্যায় উড়িষী নৃত্য। বঙ্গ অঞ্চলে মনিপুরী নৃত্য জয়দেবের প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে রাজনৈতিক কারণে সেন রাজাদের অবক্ষয় ঘটে এবং ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজীর আগমনের পর সেনদের প্রভাব ক্রমশঃ মুছে যেতে থাকে।

বখতিয়ার খিলজি একটি নতুন বিশ্বাস এবং চৈতন্য বঙ্গ অঞ্চলে নিয়ে আসেন, যার সঙ্গে এই ভূখণ্ডের লোকদের ঘনিষ্ঠ কোন পরিচয় ছিল না। এদেশে মুসলমানরা এসেছে পূর্বেই, কিন্তু ব্যাপকভাবে তাদের প্রভাব অনুভূত হয়নি। এই প্রথমবার একটি সম্পূর্ণ নতুন সভ্যতার সঙ্গে বঙ্গবাসীর পরিচয় হল। মুসলমানদের আগমনের ফলে এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন মাত্রা সংযোজিত হল। একটি নতুন স্থাপত্য রীতি এদেশে গড়ে উঠলো যা দৃশ্যত শোভন এবং ব্যবহার উপযোগিতার আদর্শস্থল। সারা দেশে মসজিদ নির্মিত হতে লাগলো এবং মসজিদের গঠনপ্রণালী একটি নতুন স্থাপত্য রীতির প্রবর্তন করলো।

মুসলমানরা বঙ্গ ভূ-খণ্ড দখল করবার পর এ অঞ্চলের সংস্কৃতির বিপুল পরিবর্তন ঘটে। সেন আমলে সংস্কৃত ভাষার যে প্রভাব ছিল সেই প্রভাব দূরীকৃত হয় এবং তার পরিবর্তে আরবী ভাষার প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি। আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা স্থাপিত হয় এবং ধর্মসাধনার জন্য 'খানকাহ' এবং মসজিদ স্থাপিত হয়। বখতিয়ার খিলজি তাঁর স্বল্প সময়ের রাজত্বকালে এই পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বখতিয়ার খিলজির আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে নতুন নগর নির্মাণ। এভাবে নগর নির্মাণের সাহায্যে একদিকে যেমন নতুন সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছিলেন অন্যদিকে তেমনি এদেশীয় গ্রামীণ সংস্কৃতিধারার মধ্যে পরিবর্তন এনেছিলেন। সেন আমলে জাতিভেদ প্রথার প্রভাবে নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষরা খুবই উৎপীড়িত ছিল। মুসলমান আগমনের ফলে এর উৎপীড়ন বন্ধ হবার সুযোগ ঘটে এবং সমাজে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ অসমর্থিত হতে থাকে।

www.pathagar.com

এটা ধারণা করা অসম্ভব নয় যে বখতিয়ার খিলজির আগমনকে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা স্বাগত জানিয়েছিল। কতকগুলো কারণে নিম্নবর্ণের মানুষদের ক্ষোভ ছিল লক্ষণ সেনের শাসনের প্রতি। প্রথমতঃ সেনরা ছিল বহিরাগত এবং তারা বহিরাগত ব্রাহ্মণ এনে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় বিঘ্ন উৎপাদন করেছিল। দ্বিতীয়তঃ দেশী মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চার বিরুদ্ধে এদের কঠোর নির্দেশ ছিল। নরকে নিক্ষিপ্ত হবার ভয় দেখিয়ে দেশী ভাষার চর্চা থেকে এরা মানুষকে বিরত রাখবার চেষ্টা করে। তৃতীয়তঃ রাজদরবারের ভাষা হিসাবে সংস্কৃত ভাষা প্রতিষ্ঠা পায় এবং এর ফলে সংস্কৃতির নতুন একটি উচ্চমার্গ জন্মলাভ করে, যার সঙ্গে নিম্নবিত্ত মানুষদের সংস্কৃতির কোন যোগাযোগ ছিল না। চতুর্থতঃ নগরের যে পরিকল্পনা এদের ছিল সে নগর ছিল সীমাবদ্ধ এবং সংকীর্ণ। নিম্নবিত্তদের বাসস্থান ছিল নগরের বাইরে অর্থাৎ নগর ছিল সম্মানিত মানুষদের জন্য এবং ব্রাহ্মণদের জন্য। এভাবে সাধারণ মানুষকে দেশের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার যে প্রবণতা গড়ে ওঠে সে প্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবেই সাধারণ মানুষ বখতিয়ার খিলজির আগমনকে স্বাগত জানিয়েছেন। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে, এ অঞ্চলের সংস্কৃতি বখতিয়ারের আগমনের পর একটি নতুন রূপব্যঞ্জনা লাভ করে।

বর্তমান বাংলাদেশের সমগ্র ভূ-খণ্ড ১৩০০ খৃষ্টাব্দের দিকে মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হয়। মোঘল সম্রাট আকবর পাঠান দাউদ শাহকে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে পরাজিত করে সমগ্র বঙ্গ ভূখণ্ডকে পদানত করেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দের দিকে সমগ্র বঙ্গ ভূখণ্ড মোগল শাসনের অধিকারে আসে। মোঘলদের পূর্বে অল্প সময়ের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে এ অঞ্চলের পর্তুগীজদের আগমন ঘটেছে। ইংরেজ, ওলন্দাজ এবং ফরাসী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান মোঘল আমলে এদেশে ব্যবসা উপলক্ষে আগমন করেছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর বঙ্গ অঞ্চলে শাসনকর্তা হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে।

মুসলমান শাসন আমলে এদেশে দেশীয় ভাষায় চর্চা হতে থাকে। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশের মূলে মুসলমান শাসনকর্তাদের সমর্থন ও সহায়তা ছিল। গৌড়ের সুলতান সিকান্দার শাহ মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি চন্ডীদাসের আশ্রয়দাতা ও সমর্থক ছিলেন। সিকান্দার শাহের সময়কাল ছিল ১৩৫৭ থেকে ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। সিকান্দার শাহের পুত্র, গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের আমলে শাহ মোহাম্মদ সগীর কাব্য চর্চা করেন। গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের সময়কাল ছিল ১৩৮৮ থেকে ১৪১০ খৃষ্টাব্দ। গৌড়ের সুলতান জালাল উদ্দীন মোহাম্মদ শাহের আমলে কৃত্তিবাস 'রামায়ণ' রচনা করেন। জালাল উদ্দীনের সময়কাল ছিল ১৪১৮ থেকে ১৪৩১ খৃষ্টাব্দ। মালাধর বসু 'ভাগবত

www.pathagar.com

পুরাণ'কে অবলম্বন করে 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচনা করেন। শাসসুদ্দীন ইউসুফ শাহের আমলে (১৪৭৪-'৮১)। ইউসুফ শাহ মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁ উপাধি দিয়েছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর 'মহাভারত' রচনা করেছিলেন গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের আমলে (১৪৯৩-১৫১৯ খৃষ্টাব্দ)। পরমেশ্বরের সমর্থক ও আশ্রয়দাতা ছিলেন হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ। এই নিদর্শনগুলি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, মুসলমানদের শাসন আমলে এদেশে সংস্কৃতির নতুন দ্বার উন্মোচিত হয় এবং পাল আমলের মত নতুন করে মাতৃভাষায় চর্চা চলতে থাকে। পালদের ধর্মীয় ভাষা ছিল পালী, ধর্মীয় অনুশাসন এবং ধর্মগ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে পালিভাষা ব্যবহার করলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা লোক ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। তেমনি মুসলমান আমলে ধর্মীয় ভাষা 'আরবী' এবং দরবারের ভাষা 'ফারসী' হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার চর্চায় মুসলমান রাজন্যবর্গ উৎসাহ প্রদান করেছেন। এই সময়কালেই বাংলা ভাষার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফারসী শব্দ এবং ফারসীর মাধ্যমে আরবী এবং তুর্কী শব্দ প্রবেশ করতে থাকে। এভাবে দুহাজারের অধিক ফারসী, আরবী ও তুর্কীশব্দ বাংলাভাষায় প্রবেশ করে।

মুসলমান আমলে বঙ্গভূখণ্ড সংস্কৃতির যে পরিবর্তন সূচিত হয় তার স্বভাব ও প্রকৃতি নিম্নরূপ ঃ

১. মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূরীকরণের মাধ্যমে একটি সাম্যবাদী প্রবৃত্তির প্রতিষ্ঠা।

২. নগর নির্মাণ ও নগরায়নের মাধ্যমে সংস্কৃতির গ্রামীণ প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন সাধন।

৩. স্থাপত্য শিল্পে নতুন মাত্রা সংযোজন এবং মসজিদ ও দুর্গের স্থাপত্য রীতির প্রবর্তন।

৪. শিল্পক্ষেত্রে ক্যালিগ্রাফি বা আরবী হস্তলিখন রীতির প্রবর্তন।

৫. দেশজ ভাষার চর্চায় উৎসাহ প্রদান এবং একটি উদার অসাম্প্রদায়িক ভাব প্রকল্পের জন্ম দান।

৬. বাংলা ভাষার রূপ ও রীতির পরিবর্তন এবং প্রচুর পরিমাণে ফারসী-আরবী তুর্কী শব্দের অনুপ্রবেশ।

সেন আমলে সংস্কৃতি ছিল মন্দিরভিত্তিক এবং রাজসভাভিত্তিক। সেন রাজারা এদেশের মানুষের সংস্কৃতিগত প্রেরণাকে অগ্রাহ্য করে শাসকবর্গ এবং মন্দিরের পুরোহিতদের জন্য একটি সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল যার ফলে ধ্রুপদী সঙ্গীত ও নৃত্য রাজসভা এবং মন্দিরের অভ্যন্তরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। মুসলমান

www.pathagar.com

আমলে এই সংস্কৃতির প্রচারে বিঘ্ন উপস্থিত হয় এবং জনজীবন ভিত্তিক একটি নতুন সংস্কৃতির রূপলাভ করতে থাকে। এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন আমরা দেখি সুলতান হোসেন শাহের আমলে। হোসেন শাহের আমলেই চৈতন্যের আবির্ভাব এবং হিন্দুধর্মের সনাতন শাসন থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তি ঘটে। চৈতন্য নিজে উচ্চবর্ণের হলেও সাধারণ মানুষের নিকটে এসেছিলেন এবং তাদের মধ্যে প্রেমধর্মের একটি প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিলেন, হোসেন শাহ চৈতন্যের ধর্মসাধনার সহায়তা করবার জন্য 'রামকেলি' নামক একটি গ্রাম চৈতন্যের ধর্ম প্রচারের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। মানুষে মানুষে ঐক্য এবং সম্প্রীতির ব্যঞ্জনা চৈতন্য নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন এবং সেক্ষেত্রে রাজ আনুকূল্য তিনি পেয়েছিলেন। হোসেন শাহের ঔদার্যে এবং সহানুভূতিতে এদেশের সকল সম্প্রদায় মিলিতভাবে বসবাস করতে সক্ষম হয়েছিল। সে কারণে তাঁকে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা 'নৃপতি তিলক' এবং 'জগতভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। হোসেন শাহের দরবারে সনাতন এবং রূপ গোস্বামী মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছিলেন। এরাই পরে শ্রী চৈতন্যের শিষ্য হন এবং সুফী মতবাদের সঙ্গে বৈষ্ণব মতবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। রূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বল নীল মনি' গ্রন্থে শ্রী চৈতন্যের সাধন পদ্ধতিকে এমন একটি রূপরেখা দান করেন যা মূলতঃ সুফী সাধন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। বঙ্গের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির এই মিশ্রণটি অভূতপূর্ব। চৈতন্যের নৃত্যগীত সাধারণ মানুষকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল। সেন আমলে কুসংস্কার এবং বন্ধনদশা থেকে হিন্দু সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য চৈতন্যের চেষ্টা চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এক প্রকার সমন্বয়বাদী সংস্কৃতি হোসেন শাহের আমলে চৈতন্যের প্রভাবে গড়ে ওঠে। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

বঙ্গদেশে মুসলিম শাসন ছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে স্বাধীন সুলতানী আমল এবং মোঘল শাসন ছিল। মোটামুটিভাবে এই সময়ের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ, জীবন চেতনা অনুসন্ধিৎসা, সামাজিক ব্যবহার বিধি, রাজনৈতিক প্রশাসন এবং বিশিষ্ট ধরনের শিল্পচর্চা এদেশের জীবনে রূপলাভ করে, বাংলা ভাষার পরিবর্তন ঘটে এবং বাংলা ভাষায় বর্ণিত জীবন কাহিনীর মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ এবং জীবন চেতনার স্বাক্ষর ধরা পড়ে। এক কথায় বলতে গেলে ইসলাম পরিপূর্ণভাবে এদেশের সমাজব্যবস্থার মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রথম থেকেই ধর্ম প্রচারণার ক্ষেত্রে মুসলমান সুফী-সাধকরা এদেশে এসেছিলেন। তাঁদের ঔদার্য, মানবহিতৈষণা, জনকল্যাণ, সকল মানুষের প্রতি সমদৃষ্টি এদেশের প্রজ্ঞায় একটি নতুন মাত্রা যোগ

www.pathagar.com

করে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটি সমন্বয়সূত্র এঁরাই আবিষ্কার করেছিলেন। যার ফলে ধর্মার্চনায় মৌলিক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও আত্মনিবেদনের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটেছিল। এর ফলেই এদেশেই বৈষ্ণবসঙ্গীত, মরমীসঙ্গীত এবং বাউল সঙ্গীতের উদ্ভব ঘটে। এ সমস্ত সঙ্গীতের মধ্যে সাধন পদ্ধতির বিবিধ আচরণের কথা নেই, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের কথা আছে। অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হচ্ছে অথবা জীবাত্মা পরমাত্মার সাথে মিলিত হচ্ছে, এই ভঙ্গিটিই এ সমস্ত গানে প্রবল। এই কারণেই আমাদের সংস্কৃতিতে সমন্বয়বাদিতা প্রবল।

যে ধারাক্রম অনুসারে এখানে বিভিন্ন ধর্ম বিকাশ লাভ করেছে সেই ধারাক্রমের প্রাথমিক পর্যায়ে বৌদ্ধ ধর্ম আছে।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবক্তা এবং প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধার্থ ছিলেন নেপালের পাদদেশে অবস্থিত এক আঞ্চলিক রাজ্যের রাজপুত্র। মানুষের জীবনে জন্ম, জরা, বার্ধক্য এবং মৃত্যু লক্ষ্য করে তার মনে বিভিন্ন প্রশ্ন উদিত হয়। জিজ্ঞাসা জাগে, কেন মানুষের জন্ম হয়? যদি মৃত্যুতেই তার অবধারিত শেষ, কেন যৌবনময় সুঠাম দেহধারী মানুষ বার্ধক্যে অথর্ব হবে, কেন অবশেষে মৃত্যু এসে জীবনকে নিঃশেষ করবে? এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি গৃহত্যাগ করেন। অবশেষে সিদ্ধিলাভ করে গৌতমবুদ্ধ বলে পরিচিত হন। গৌতমবুদ্ধ বিনয়, অহিংসা এবং সমন্বয়বাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষে মানুষে জাতিভেদ প্রথা বিলোপ করে সকল মানুষকে তিনি একই পংক্তিতে দাঁড় করিয়েছিলেন। তিনি জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধন করেন এবং সকল মানুষকে একই সম্ভ্রমের আসনে অবস্থিত করেন। তাঁর মূলবক্তব্য ছিল যে, মানুষের মুক্তির প্রয়োজন– সর্বপ্রকার বেদনা থেকে মুক্তি, সংকট থেকে মুক্তি, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি এবং অহমিকা থেকে মুক্তি। তিনি এই মুক্তির নামকরণ করেন 'নির্বাণ'। এই 'নির্বাণ' লাভের জন্য কয়েকটি প্রক্রিয়ার তিনি নির্দেশ দেন। এই নির্দেশগুলো সংক্ষেপে হচ্ছে– আত্মজ্ঞান লাভ করা অর্থাৎ নিজের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা, কামনা, লালসাকে জয় করা, বিনয়কে লভ্য করা, বিশুদ্ধতাকে জীবনে আনয়ন করা, সততার প্রতিষ্ঠা ঘটানো এবং অহিংসাকে অবলম্বন করা। বৌদ্ধধর্ম সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে নিরুত্তর। কিন্তু মানুষের মুক্তির জন্য সর্বস্ব ত্যাগের কথা উক্ত ধর্মে বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম পাল রাজত্বকালে পূর্ণ প্রতাপের সঙ্গে বিদ্যমান ছিল এবং পাল রাজত্বকালে গণতন্ত্রায়ণ ও মানুষে মানুষে বৈষম্য দূরীকরণ বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শকে প্রকাশ করে। পাল রাজত্বের পর সেনদের আমলে বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার চলতে থাকে তখন বৌদ্ধরা হিন্দুতান্ত্রিকদের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। চর্যাগীতিকায় বৌদ্ধদের এই

www.pathagar.com

তন্ত্রসাধনার ব্যাখ্যা আছে। একসময় আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে বাংলাদেশ থেকে বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীপংকর আমন্ত্রিত হয়ে তিব্বত গিয়েছিলেন সেখানকার বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার সাধনের জন্য। সে সময় বাংলাদেশে বৌদ্ধদের মহাযান মতবাদটি প্রবল ছিল। বর্তমানকালে বাংলাদেশে হীনযান মতধারাই প্রতিষ্ঠিত।

বৌদ্ধদের ধর্মীয় ভাষা 'পালি' এবং পালি ভাষায়ই ধর্মীয় প্রজ্ঞা এবং নির্দেশাবলী সাধারণতঃ রচিত হলেও বাংলাদেশের স্থানীয় ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা চলছিল। আমরা পাল আমলের যে সমস্ত 'দোহাকোষ' পাই সেগুলো সবই পূর্ব অপভ্রংশে রচিত এবং এভাবে দেখা যায় যে ধর্মবোধ সাহিত্য বোধের জন্ম দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য বোধের মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি রূপলাভ করেছে। আমরা বৌদ্ধ মতবাদের মাধ্যমে 'ক্ষণিকত্ববাদ', 'শূন্যবাদ' এবং 'পরিনির্বাণ'-এর কথা জেনেছি। এগুলো কাব্য ও সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণে অনেক সময় ব্যবহার হয়েছে। তাছাড়া পালি ভাষা থেকে বাংলা ভাষার অনেক শব্দের উৎপত্তি আমরা নির্ণয় করতে পারি। যেমন লাপু থেকে লাউ, উধধান থেকে উনান, ঝাম থেকে ঝামা, গাবী থেকে গাভী, দরথ থেকে দরদ, সিম্ব থেকে শিমুল ইত্যাদি। এ কথাগুলো বলা হলো এ কারণে যে বৌদ্ধদের অবস্থান এবং বিকাশের কারণে বঙ্গ-অঞ্চলের সংস্কৃতির বিপুল পরিবর্তন ঘটেছিল। বৌদ্ধরা মানুষের মনকে ভ্রমপাশ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তির প্রাধান্য ঘোষণা করেছিলেন। বৌদ্ধদের মূল বিশ্বাস হচ্ছে কর্মফল, তারা কর্মফলবাদী। তাদের মতে কর্মশুদ্ধিই নির্বাণ লাভের একমাত্র উপায়। বুদ্ধদেবের একটি কথা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, যেমন গঙ্গা, যমুনা, সরযু, অচিরবর্তী প্রভৃতি নদী সকল সমুদ্রে পড়ে নিজ নিজ নাম হারায় এবং সমুদ্রেই অংশীভূত হয়, সেইরূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র সংঘে প্রবিষ্ঠ হলে তাদের আর জাতিগত পার্থক্য থাকে না। বৌদ্ধরা বলে থাকে যে নির্বাণ লাভ করতে হলে চিত্তে অকুশল চিন্তা প্রবেশ যাতে না করে সেই চেষ্টা করতে হবে, শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্জন করতে হবে, চিত্তে প্রীতি ও প্রশমতা লাভ করতে হবে কায়িক, বাচসিক সংযম আরাধ্য করতে হবে। মোটকথা বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন আদর্শগুলো বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাপনের ভিত্তিমূলে কাজ করেছে এবং এদেশের মানুষের মানসিকতা নির্মাণে সহায়তা করেছে।

বাংলাদেশ অঞ্চলে আর্যরা পূর্বে এলেও এ অঞ্চলে তারা প্রথমে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেনি। সেনদের আমলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হিন্দুধর্ম বাংলাদেশে বিকাশ লাভ করে। উচ্চবর্ণে বহিরাগত ব্রাহ্মণদের আগমন ঘটে এবং সমাজে মন্দিরের

www.pathagar.com

অধিকার এবং শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। সঙ্গীত ও নৃত্যে ধ্রুপদী ব্যঞ্জনা মন্দিরের উপাসনা পদ্ধতিতে প্রবেশ করে এবং সংস্কৃতির একটি নতুন রূপরেখা দানা বাঁধতে থাকে। আমরা জানি যে হিন্দু ধর্মের কোন প্রবর্তক বা প্রতিষ্ঠাতা নেই এবং দৈবপ্রাপ্ত কোন ধর্মগ্রন্থ নেই। 'গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, মানুষের একমাত্র কর্ম করবার অধিকার আছে, এই কর্মই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের মৌলিক মতবাদ। এই মতবাদের সঙ্গে পুনর্জন্ম মতবাদের প্রত্যক্ষ যোগ আছে। পুনর্জন্ম মতবাদে বলা হয়ে থাকে যে, সকল প্রাণী একটি আনুক্রমিক শ্রেণী বিভাগের সদস্য এবং নিজ কর্মফল অনুযায়ী পরবর্তী জীবনে প্রতিটি প্রাণী উচ্চতর বা নিম্নতর প্রাণীতে পুনর্জন্ম লাভ করবে। এছাড়া হিন্দু ধর্মাবলম্বী সকলেই কোন না কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত। এই জাতিভেদের ফলে হিন্দু ধর্মের মানুষ বিভিন্ন বর্ণ বা গোত্রে বিভক্ত হয়েছে। বাংলাদেশে বৌদ্ধমতবাদের সংস্পর্শে এসে এবং পরবর্তীতে ইসলামের সংস্পর্শে এসে হিন্দুদের মধ্যে নতুন ধরনের চিন্তা জন্মলাভ করে। সুফী মতবাদের সংস্পর্শে আসার ফলে বৈষ্ণব মতবাদ একটি সমন্বয়বাদী মতবাদে পরিণত হয়। বৈষ্ণবদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা নেই। যে মুহূর্তে একজন ব্যক্তি বৈষ্ণব গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করছে সে মুহূর্তেই হিন্দু হিসাবে তার যে শ্রেণীভাগ ছিল সেগুলো বিলুপ্ত হচ্ছে। তেমনি বাউল ও মরমী মতবাদ এদেশে প্রচার লাভ করে, যার কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এদেশের হিন্দুরা নিজেদের সংস্কার এবং পূজা-পার্বণের মধ্যে অবস্থান করেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমন কতকগুলো নিদর্শন সৃষ্টি করে যার সঙ্গে অন্য ধর্মাবলম্বীর কোন বিরোধ ছিল না। মুসলমানদের খাদ্য স্বভাবে, বিবাহের লৌকিক আচরণে, নারীদের অলংকার বিভূষণে এদেশের হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। তেমনি আবার ইসলামের মানবপ্রীতি এবং মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের ফলে এদেশেরে বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির সার্বক্ষণিক কমকাণ্ডগত চৈতন্যের রূপ। এই চৈতন্যের মধ্যে ইসলাম, বৌদ্ধ এবং হিন্দু প্রতিটি ধর্মই কিছু না কিছু দান করেছে। এ অঞ্চলের প্রধান ধর্ম হিসেবে ইসলাম এদেশের সমাজ জীবনে বিবিধ কর্মকাণ্ডের যে স্বরূপ নির্মাণ করছে তার সঙ্গে অন্য ধর্মেরই কিছু কিছু চৈতন্য এসে যোগ দিয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এটা বলতে হয় যে, এখানে মূলত ইসলাম ধর্ম হিন্দুধর্মকে প্রতিস্থাপিত করেছে অর্থাৎ হিন্দুধর্মের স্থানে ইসলাম ধর্ম প্রধান প্রেরণা হিসাবে জাগ্রত হয়েছে।

ধর্ম হচ্ছে সংস্কৃতির একটি প্রধান উপাদান। ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। ইসলাম ধর্মের মূল বিশ্বাস হচ্ছে বিশ্বস্রষ্টা সর্বশক্তিমান আল্লাহর

www.pathagar.com

অস্তিত্বে শ্রদ্ধাবনত বিশ্বাস। হিন্দুরা বহু দেবদেবীবাদী কিন্তু তারাও এক পরম পিতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এই অর্থে যে দেবদেবীদের মাধ্যমে সেই পরম পুরুষের আস্বাদন লাভ করা যায়। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ধর্ম এখানে কেবলমাত্র ধর্মীয় রীতিনীতি এবং অনুশাসনই নিয়ন্ত্রণ করেনি, বরঞ্চ মানুষের সামগ্রিক জীবনধারাকেও প্রভাবিত করেছে। এছাড়া প্রাত্যহিক জীবনেও কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মের অনুশাসন কার্যকর ব্যবস্থা হিসাবে বিদ্যমান থাকে। মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনে ধর্ম একটি বিশেষ শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ধর্মের সাহায্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন এবং ঐক্য সম্ভব হয়েছে। মানুষের জীবন যাপন এবং সামাজিক কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে ধর্ম এদেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ অঞ্চলের ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব অনস্বীকার্য। পালি ভাষা, সংস্কৃত ভাষা এবং আরবী ভাষা বাংলা ভাষাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। বৌদ্ধ, হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মের ব্যাপক বিস্তারের ফলে এ অঞ্চলের ধর্মীয় ভাষাগুলো গুরুত্ব পেয়েছিল। এদেশের কৃষি কর্মের মধ্যে ধর্মীয় আচার প্রবেশ করেছে। যেমন, শস্য রোপণ বা ফসল কাটার সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রচলন এদেশে আছে। খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধেও এদেশে ধর্মের কারণে বিভিন্ন রীতি ও প্রথা প্রচলিত হয়েছে। এভাবে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখবো যে আমাদের জীবনে বহু খুঁটিনাটি বিষয়ে ধর্মের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে।

এদেশে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর খ্রীষ্টান ধর্ম এ অঞ্চলে অংশতঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্যের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের বিকাশ ঘটে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মাধ্যমে বাংলা গদ্যের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের বিকাশ ঘটে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মাধ্যমে বাংলা গদ্যের একটা লিখিত রীতি প্রবর্তিত হয় যার ফলে এদেশের সাহিত্য সংস্কৃতিতে একটি বিপ্লব সৃষ্টি হয়। বিদেশী খ্রীষ্টানগণ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন সন্দেহ নেই, কিন্তু বাংলা গদ্য সৃষ্টির ফলে পরবর্তীতে এদেশের মানুষ সামগ্রিকভাবে উপকৃত হয়। ইংরেজি ভাষার প্রচলন এদেশের সংস্কৃতিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদে পরিবর্তন আসে, আমাদের খাদ্রগ্রহণ এবং খাদ্য পরিবেশন পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আসে। কিন্তু একটি কারণে খ্রীষ্টান ধর্ম এদেশে অন্য কোন ধর্মের স্থান অধিকার করতে পারেনি; সে কারণটি হচ্ছে, যে খ্রীষ্টান ধর্ম এদেশে এলো সে খ্রীষ্টান ধর্ম পাশ্চাত্যের বিধিব্যবস্থায় সংগঠিত। খ্রীষ্টান ধর্মের উদ্ভব মধ্যপ্রাচ্যে হলেও মূলতঃ

www.pathagar.com

এর গঠনপ্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটে প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যে রোমক শাসনকালে। খ্রীষ্টান ধর্ম প্রবলভাবে রোম এবং গ্রীসে প্রবর্তিত হয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর খ্রীষ্টধর্ম সমগ্র ইউরোপে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। রোমকদের বিশ্বাস এবং চিন্তার দ্বারা খ্রীষ্টান ধর্মের আচরণবিধিতে অনেক পরিবর্তন আসে এবং এই সমস্ত আচরণবিধিকে সমুন্নত রাখবার জন্য খ্রীষ্টান ধর্ম গীর্জার শাসনের অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। আমাদের দেশে যে খ্রীষ্টধর্ম আসে সে খ্রীষ্টান ধর্ম এই গীর্জার অনুশাসনবদ্ধ খ্রীষ্টান ধর্ম এবং সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় মেজাজের। এর ফলে খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরা এদেশের সমাজ জীবনের সাথে ওতপ্রোত হতে পারেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা লক্ষ্য করি যে, সাধারণ মানুষের বিচারে খ্রীষ্টান ধর্ম ছিল রাজার ধর্ম এবং সেই অর্থে সম্মানের ভূষণ। দ্বিতীয়তঃ হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার ফলে যে অন্ত্যজ শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল তাদের জন্য খ্রীষ্টান ধর্ম এনেছিল মুক্তির বরাভয়। তৃতীয়তঃ আধুনিক জীবনের সমৃদ্ধির সঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্মের যোগসূত্র রয়েছে– এই বিশ্বাস সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল ছিল। চতুর্থতঃ আমাদের দেশে যে বিদেশী শাসন ছিল সে বিদেশী শাসন ছিল খ্রীষ্টানদের। এই সমস্ত কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টান ধর্ম আমাদের দেশের নাগরিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেনি। কিন্তু ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের অবসানের পর থেকে এই প্রভাব কমে যেতে থাকে এবং বর্তমানে সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবনে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব ক্ষীণ।

খ্রীষ্টান ধর্ম ত্রিত্ববাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই বিশ্বাসে ভগবানের তিনটি স্বরূপ অভিব্যক্ত– একটি হচ্ছে; পিতা রূপে ভগবান; একটি হচ্ছে পুত্ররূপে ভগবান; আরেকটি হচ্ছে পবিত্র আত্মারূপে ভগবান। এই বিশ্বাসটি মুসলিম চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই কারণে বর্তমানে আমরা লক্ষ্য করি খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীরা তাদের নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। গণ্ডীর পরিধি তাঁরা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের বিশ্বাসের প্রতিবেদন মুসলমান সমাজে সাড়া জাগায়নি। আমাদের দেশে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচলনের পথে কোন বাধা নেই এবং ধর্ম প্রচারেরও কোন বিধি-নিষেধ নেই কিন্তু সামাজিকভাবে কোন সমন্বয় ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের নেই। এই পটভূমিটি স্মরণে রেখে আমরা লক্ষ্য করি যে, ধর্মগত বৈচিত্র্য আমাদের সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। খ্রীষ্টানদের বিবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান এই বৈচিত্র্যকে সুচিহ্নিত করে। তাছাড়া আমাদের জাতীয় জীবনের সামাজিক বিবর্তনে ধর্ম একটি প্রধান

www.pathagar.com

শক্তিরূপে কাজ করে চলেছে। এভাবে আমরা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব যে আমাদের সংস্কৃতিতে বৌদ্ধ এবং হিন্দু বিশ্বাসের ক্রমধারা আছে, ইসলামের প্রবাহমান ঐহিত্য আছে, এবং খ্রীষ্টান ধর্মের সাহায্যে একটি আন্তর্জাতিক স্বভাবের সভ্যতার ধারা আছে। আমাদের সংস্কৃতি প্রসারের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের সকল ধর্মের ধর্মীয় ভাষাগুলো চিরদিন গুরুত্ব পেয়েছে এবং এই গুরুত্বের নিদর্শন বাংলা ভাষারই– যেখানে পালি, সংস্কৃত এবং আরবী-ফারসী প্রবেশ করে ভাষার নবরূপায়ণ ঘটিয়েছে। ইংরেজী ভাষাও আমাদের ভাষার প্রকৃতিতে পরিবর্তন এনেছে। আমাদের দৃষ্টিতে ইংরেজী ভাষা খ্রীষ্টান ধর্মের ভাষা। যদিও ক্রমান্বয়ে বাংলা ভাষার মাধ্যমে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের কারণে ধর্মীয় ভাষা হিসেবে নিজস্ব স্বভাবের অহংকার ইংরেজি ভাষার ততটা নেই যতটা পূর্বে ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উন্নত এবং অনুন্নত কথাটি প্রচারিত হয়েছিল। তার কারণ শাসকগোষ্ঠী তাদের সভ্যতার অনুকূলে এদেশের জীবনযাত্রার মান গড়ে তুলতে চেয়েছিল। সে সময় সমৃদ্ধির সোপানে আরোহণ করার জন্য এবং সমাজে সম্মানিত বলে গ্রাহ্য হবার জন্য অনেক লোক খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বর্তমানে এটা আমরা বিশ্বাস করি যে মানব সভ্যতার ঐতিহ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠী এবং ধর্ম সম্প্রদায়ের দান রয়েছে। এক্ষেত্রে কেউ কারও কাছ থেকে উন্নত বা অনুন্নত নয়।

বর্তমান সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা অন্তর্গত হয়েছে। কিন্তু এই অন্তর্ভুক্তি কোন বিশেষ ধর্মীয় শিক্ষা নয়, সেখানে সকল ধর্মের শিক্ষাই বিদ্যমান রয়েছে। এক্ষেত্রে যে আদর্শটা সক্রিয় তা হচ্ছে, সকল বিদ্যার্থী একটি আস্তিক্যবাদে যেন গড়ে ওঠে। হিন্দুদের জন্য হিন্দুধর্ম শিক্ষা, বৌদ্ধদের জন্য বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা, মুসলমানদের জন্য ইসলাম ধর্ম শিক্ষা এবং খ্রীষ্টানদের জন্য খ্রীষ্টীয় ধর্ম শিক্ষা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান। এখানে সহাবস্থানের একটি প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। সকল ধর্মের সারতত্ত্ব নিয়ে নীতিশিক্ষার প্রচলন এখানে ঘটেনি, কিন্তু প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী আপনাপন ধর্মীয় গণ্ডীতে বিশ্বাসী হয়ে যাতে গড়ে ওঠতে পারে সেই চেষ্টা এখানে আছে। সুতরাং এখানে একধরনের মিশ্রিত ধর্মশিক্ষা বলা যায়। টি,এস, ইলিয়ট তিন ধরনের ধর্মীয় শিক্ষার কথা বলেছেন ঃ প্রথমত হচ্ছে একটি একক ধর্মীয় শিক্ষা যা রাষ্ট্রীয় ধর্ম, যদি রাষ্ট্রে কোন ধর্ম থেকে থাকে। দ্বিতীয়তঃ সকল ধর্মের সারতত্ত্ব নিয়ে একটি মাত্র নীতি শিক্ষার প্রবর্তন এবং তৃতীয়তঃ একটি মিশ্রিত ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা যেখানে প্রত্যেক

www.pathagar.com

ধর্মাবলম্বীর নিজস্ব ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। টি.এস. ইলিয়ট প্রতিটি ব্যবস্থারই সুবিধা অসুবিধারই কথা বলেছেন কিন্তু তিনি মূলতঃ বলতে চেয়েছেন যে ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রশ্রয় না থাকলে কোন শিক্ষাব্যবস্থা বিদ্যার্থীদের জীবন গঠনে যথার্থভাবে সহায়তা করে না।

আমাদের দেশে মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা রয়েছে, খ্রীষ্টানদের জন্য মিশনারী স্কুল রয়েছে, হিন্দু ও বৌদ্ধদের জন্য নিজস্ব ধর্মীয় শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা আছে কিন্তু তা জীর্ণ প্রায়। এক সময় বৃটিশ আমলে হিন্দুদের ধর্মশিক্ষার জন্য টোল ছিল, বর্তমানে তা গুরুত্ব হারিয়েছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজন এবং বিধিবদ্ধ নিয়ম-শাসনের মধ্যে আনয়নের প্রয়োজন।

প্রধান কয়েকটি ধর্ম ছাড়া আমাদের দেশে উপজাতি আদিবাসীদের কিছু প্রাকৃতিক ধর্ম আছে যে ধর্মগুলো বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে খুব লঘুভাবে হলেও কিছু বৈচিত্র্য এনেছে। তাদের ধর্মীয় আচার নিষ্ঠার সঙ্গে কিছু সামাজিক কর্মকাণ্ড গড়ে উঠেছে যেগুলো সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে। কেননা, উপজাতি আদিবাসীদের ধর্ম এবং সামাজিকতার সঙ্গে এগুলো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাদের সঙ্গীত এবং নৃত্য তাদের ধর্ম সাধনার অঙ্গীভূত। সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এগুলো ক্রমশঃ হারিয়ে যাবে। সুতরাং এ সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

মানুষ নিজেকে জানতে চায় এবং পৃথিবীর সঙ্গে তার সম্পর্ককে জানতে চায়। এই জানার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কোন উত্তর সে খুঁজে পায়না, তখন সে কতকগুলো বিশ্লেষণকে অবলম্বন করে। এই বিশ্বাস প্রচারিত কোন বিশ্বাস হতে পারে অথবা আপনাপন সমাজ থেকে উদ্ভূত কোন বিশ্বাস হতে পারে। সুতরাং মনে রাখতে হবে প্রত্যেক সংস্কৃতির মধ্যে প্রতিষ্ঠানগত ধর্মবিশ্বাসের স্থান রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি আপনাপন মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে থাকে। প্রত্যেক সমাজের মধ্যে ধর্ম আছে, কিন্তু ধর্মে বিশ্বাস এবং আচরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। কোন সামাজিক মানুষ তাদের পূর্বপুরুষদের পূজা করে, আবার কোন সমাজে প্রাকৃতিক কোন শক্তিকে পূজা করে, প্রাণীকে পূজা করে এমন সমাজও আছে। আমাদের সমাজে ইসলাম ধর্মের প্রবল প্রভাব থাকলেও উপজাতি আদিবাসীদের এই সমস্ত বিচিত্র বিশ্বাসকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এবং সংস্কৃতিতে তারা বৈচিত্র্য এনেছে এবং আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এগুলোর গুরুত্ব অনেক।

আমাদের সংস্কৃতিতে বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব নিম্নরূপে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করা যায় (এদেশে বিভিন্ন ধর্মের প্রকাশকাল হিসেবে ধারাক্রম করা হয়েছে) ঃ

www.pathagar.com

ধর্ম	ধর্মের স্বভাব এবং প্রকৃতি	জীবনাদর্শ	সাংস্কৃতিক লক্ষণ
বৌদ্ধ	মঠাশ্রয়ী ধর্ম, ভিক্ষু জীবন, জাতিভেদ বিলোপ	বিনয় এবং নির্বাণ	অহিংসা, সমন্বয়বাদ, ধর্মীয়ভাষার সৃষ্টি, সাহিত্যে মানবতাবোধ বিশিষ্ট ধরনের স্থাপত্য
হিন্দু	সমাজভিত্তিক, দেব-আরাধনা, জাতিভেদ, পুনর্জন্ম	লালসা-মুক্তি, ভক্তি ল দেব-শরণ পূজার্চনা	সংস্কৃত ভাষার বিকাশ, সঙ্গীত এবং নৃত্য। পোশাক ও খাদ্যের বিশিষ্টতা, মন্দির স্থাপত্য
ইসলাম	একেশ্বরবাদ, অলৌকিক গ্রন্থ-ভিত্তিক	বিশ্বাস এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব। সুফীবাদের বিনয়	স্থাপত্য ও হস্তলিখন শিল্পের বিকাশ, দেশজ ভাষার বিকাশ, পোশাক ও খাদ্যের বিশিষ্টতা, সুফী সাধনায় সঙ্গীতের ব্যবহার
খ্রীষ্টান	ত্রিত্ববাদ, আদি-পিতার পাপ এবং সেজন্য মুক্তির সাধনা, গীর্জাশ্রয়	অহিংসা ও ভ্রাতৃত্ব	বিজ্ঞান চর্চা, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা বিশিষ্ট ধরনের স্থাপত্য, পোশাকের বিশিষ্টতা, আন্তর্জাতিকতা

উপজাতি/আদিবাসীদের ধর্ম আমাদের সংস্কৃতিতে লোক বিশ্বাস এবং উক্ত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে সঙ্গীত ও নৃত্যের বিশিষ্ট ধরনের পরিচর্যা এসেছে।

আমাদের সংস্কৃতি একটিমাত্র একক ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতি নয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে কখনও কখনও একক ধর্মে অনুশাসনটি বিদ্যমান থাকে। যেমন– খ্রীষ্টান ধর্মে নিজস্ব মণ্ডলীবদ্ধ সামাজিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক আচরণ অন্য কোন ধর্মাবলম্বীদের জন্য সত্য নয়, তেমনি আবার হিন্দু ও বৌদ্ধদের নিজস্ব পূজা-অর্চনা বিধি আপনাপন মণ্ডলীর জন্যই সত্য। এগুলো হচ্ছে বিশেষ বিশেষ ধর্মের নিজস্ব সীমাবন্ধনের শাসন। এ সমস্ত সত্ত্বেও আমাদের জীবনযাত্রার মধ্যে একটি সমন্বয়বাদী সংস্কৃতির প্রশ্রয় দেখা যায়।

পলাশীর যুদ্ধের পর এদেশে পূর্ণভাবে ইংরেজি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলতঃ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নিজেদের হাতে গ্রহণ করে। এদেশে সংস্কৃতির মধ্যে তখন থেকেই পরিবর্তন আসতে থাকে। ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজি রাজভাষা রূপে গৃহীত হয়। প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের ফলে মুসলমান সমাজ

www.pathagar.com

অনেক পিছিয়ে পড়ে। তারা বাস্তব অবস্থাকে অনেক দিন স্বীকার করে নিতে পারে না। অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাঙালী হিন্দু সমাজকে উদার আহ্বান জানান রামমোহন। সমাজ ও 'ধর্মসংস্কারের এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় সে যুগে যে তীক্ষ্ণ মুক্তবুদ্ধি ও মনীষার পরিচয় দেন, নব্য হিন্দু ভারতে তার তুলনা খুব বেশি নেই। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সিভিলিয়ানদেরকে এ দেশের রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত করার এবং এদেশের ভাষা শিক্ষা দেবার জন্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ (অধুনা প্রেসিডেন্সী কলেজ)। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে শিক্ষকতা এবং বাংলা গদ্য সৃষ্টির কাজ উপলক্ষে এ দেশের হিন্দুদের কিছুসংখ্যক লোক ইংরেজদের সংস্পর্শে আসে।

এরপরে হিন্দু কলেজে বাঙালী হিন্দুদেরকেই লেখাপড়া শিখতে দেখা যায়। মুসলমানরা হিন্দুদের অনেক পরে ইংরেজি শিক্ষাকে গ্রহণ করে। এই বিলম্বের কারণে মুসলমানগণ শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর এবং পশ্চাদপদ হয়ে পড়ে। তদুপরি সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রভূমির পরিবর্তন ঘটে। পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত রাজধানী মুর্শিদাবাদই ছিল সমগ্র বাংলাদেশের প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। রাজশক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক জীবন নিঃশেষিত হয় এবং নতুন রাজধানী কোলকাতাকে কেন্দ্র করে নতুন সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ব্যবধান প্রবল হতে থাকে এবং সাংস্কৃতিক পটভূমিতে হিন্দুদের প্রাধান্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দীর্ঘকাল ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের সমাজ জীবনে পাশ্চাত্য প্রভাব এসেছে এবং দেশীয় সংস্কৃতির মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। আমাদের গৃহনির্মাণ প্রকল্প, উৎসব আনন্দ, খাদ্য স্বভাব, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা ব্যবহার সকল ক্ষেত্রেই পরিবর্তন এসেছে। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক চিন্তা রাজনৈতিক প্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট আমাদের জীবনের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক মানুষ যে আপন স্বদেশীয় বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও বিশ্ব নাগরিক হতে পারে সেই বোধ আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়। সংস্কৃতিকে এখন আর খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ করে দেখা সম্ভব হয় না। সংস্কৃতি আপন গতিবিধিতে সমগ্র বিশ্বকে স্পর্শ করতে থাকে। ইংরেজ শাসনের যে কয়টি শুভ ফল আমরা পেয়েছি তার মধ্যে একটি হচ্ছে ভাষার সাহায্যে সংস্কৃতির বিকাশ। এই আমলে বাংলা ভাষার গ্রহণ ক্ষমতা এবং প্রকাশ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। দেশের সমাজ জীবন থেকে অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কার দূরীকৃত হতে থাকে এবং শুধুমাত্র পশ্চাদমুখিতা থেকে মুক্ত হয়ে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে শেখে। যদিও

www.pathagar.com

সামগ্রিকভাবে সমগ্র দেশের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়নি এবং সেটা সম্ভবপরও ছিল না, কিন্তু এদেশের মানুষ অতিদ্রুত মধ্যযুগীয় ভাবাদর্শ থেকে আধুনিক সমাজ জীবনের এই সময়েই প্রবেশ করে।

পাশ্চাত্যের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের ফলে আমাদের দেশের সংস্কৃতির মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। পৃথিবীর প্রতিটি সংস্কৃতি অনবরত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। সংস্কৃতি যেহেতু গতিশীল, সুতরাং কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির মধ্যে পরিবর্তনশীলতা আসে, নব নব উদ্ভাবন ঘটে, সমন্বয় ঘটে, পরিহারও ঘটে। সংস্কৃতির এই গতিশীলতা কখনও সময়কালের প্রেক্ষাপটে নির্দিষ্ট হয়ে যায় না। বিভিন্ন সময় ও অঞ্চলে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে এবং হারে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে এবং এই রূপান্তরের মাধ্যমে সংস্কৃতির নিজস্ব পুষ্টি সাধিত হয়। কোনও কোনও সংস্কৃতির বিকাশ ও রূপান্তর অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সংঘটিত হয়েছে; যেমন ইউরোপীয় সংস্কৃতি, আবার অনেক সংস্কৃতি বহুকাল পর্যন্ত মোটামুটি স্থিতিশীল ও অপরিবর্তিত থাকছে; যেমন উপজাতি/আদিবাসীদের সংস্কৃতি। শেষোক্তরা সাধারণত কোনও উদ্ভাবন বা নব প্রবর্তনকে সহজে মান্য করতে চায় না। তাদের সংস্কৃতির অভ্যন্তরে সহজে এই ধরনের উদ্ভাবন বা নব প্রবর্তন আসে না। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সংস্রবের ফলে উপজাতি /আদিবাসীদের জীবনে পরিবর্তন এসে থাকে এবং এ পরিবর্তন ঘটে সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমে এবং সমন্বয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। মূলতঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে সংস্কৃতির পরিবর্তন দ্রুত সংঘটিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে সংস্কৃতির মধ্যে নতুন নতুন উদ্ভাবন জন্মলাভ করে। বিজ্ঞানের কারণেই মানুষের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসে, সামাজিক জীবনে এবং আচার ও প্রথারও পরিবর্তন সৃষ্টি হতে পারে। এদেশে ইংরেজদের আগমনের পরে মুদ্রণ শিল্পের উদ্ভাবন এবং বিকাশ ঘটে। এই মুদ্রণ শিল্পের ফলে এদেশের সংস্কৃতিতে প্রকৃত পরিবর্তন সাধিত হয়। ইংরেজি ভাষার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঘটে এবং অনুবাদের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন গ্রন্থ এদেশে পরিচিত হয়। এমনকি শেক্সপীয়ারের একটি নাটকের কাহিনী আমাদের লোককাহিনীতেও প্রবেশ করেছে। তাছাড়া ভারতীয় বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটে।

এক কথায় বলা যায় মুদ্রণ শিল্পের প্রবর্তনের ফলে আমাদের সংস্কৃতির প্রসার ঘটে যাকে বলে 'ডিফিউশন' বা পরিব্যাপ্তকরণ। মুদ্রণ শিল্পের সাহায্যে তার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। এভাবে আমাদের সংস্কৃতিতে সাংস্কৃতিক ঋণের একটি প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা ঘটে। ক্রমশঃ অন্যান্য অঞ্চলের প্রলক্ষণগুলো বাংলাদেশ অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করে।

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমান বাংলাদেশ পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল হিসাবে প্রথমে পূর্ববঙ্গ ও পরে পূর্ব পাকিস্তান নামে অভিহিত হয়। যদিও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিক রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের সৃষ্টি, কিন্তু এর পিছনে বিরাট অর্থনৈতিক কারণ ছিল। জমিদার শ্রেণী এবং ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির উদ্দেশেই পাকিস্তান আন্দোলন আরম্ভ হয়। তখন এই জমিদার, ব্যবসায়ী এবং পুঁজিপতিদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং আন্দোলনটি এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অন্য সম্প্রদায়ের আন্দোলনে পরিণত হয়। প্রচণ্ড বিদ্বেষ, বিক্ষোভ এবং সংঘর্ষের পরিণতিতে পাকিস্তানের জন্ম হয়। এর ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা বিদ্যমান থাকে। তাই আমরা লক্ষ্য করি যে তখন পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ একই আদর্শ এবং একই সাংস্কৃতিক প্রজ্ঞার মধ্যে সমগ্র পাকিস্তানকে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। যার ফলে অল্প দিনের মধ্যে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ভাষাভাষীদের সঙ্গে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিবাসীদের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। প্রথম সংঘর্ষ বাধে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। সমগ্র পাকিস্তানকে একক সাংস্কৃতিক গ্রন্থিতে আবদ্ধ করবার অবাস্তব পরিকল্পনায় উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করবার চেষ্টার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধতা জাগে এবং বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন রূপলাভ করে। এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিরোধ ও সংঘাতের মধ্য দিয়েই আমরা অগ্রসর হতে থাকি এবং সামগ্রিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে আমাদের বিরোধ প্রধান ও প্রবল হয়ে ওঠে। এরই ফলে স্বাধিকার আন্দোলনের দীর্ঘ পথ ধরে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয় এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের সংস্কৃতির আদর্শ ও প্রত্যয় সম্পর্কে আমরা যে নীতিমালা চিহ্নিত করতে পারি তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১. আমাদের আবহমান ঐতিহ্যের অনুসরণ; জনগণের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মচেতনার অনুষঙ্গরূপে প্রাপ্ত নৈতিক চেতনাকে সমুন্নত রাখার প্রয়াস।

২. ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত বাংলাদেশের মানুষের মানবতাবোধের সঙ্গে বিশ্ববোধের ঐক্যসাধন।

www.pathagar.com

৩. আমাদের লিখিত-অলিখিত সুদীর্ঘ সংগ্রামী ইতিহাস, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মহান আদর্শ যাতে জাতীয় জীবনে অবিনশ্বর রূপ লাভ করে তার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. জাতীয় জীবনে সহনশীলতার ভাবধারাকে জোরদার করে কার্যকর গণতান্ত্রিক বোধের বিকাশ সাধন, বিদেশী সংস্কৃতির সুকৃতি গ্রহণ ও অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।

৫. সর্ববিধ উপায়ে জাতীয় সংস্কৃতির অবক্ষয় রোধ এবং সংস্কৃতির সঙ্গে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন।

৬. বাংলাদেশে বিদ্যমান সকল ধর্মাবলম্বীদের ধর্মচর্চা ও অনুষঙ্গী কার্যক্রম পরিকল্পনার ও বাস্তবায়নের অবাধ সুযোগ রয়েছে এবং থাকবে। তবে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে যার দ্বারা অন্য সম্প্রদায়ের মনমানসিকতা আহত হবার সম্ভাবনা থাকে। সাম্প্রদায়িকতাশূন্য বর্তমান বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সম্প্রীতি পরিপূরক কার্যক্রমের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মানুষের জাতিসত্তার ইতিহাসগত পরিপ্রেক্ষিত

'বংগ' শব্দটির উল্লেখ বহু প্রাচীন যুগে পাওয়া গেলেও দেশ হিসাবে বংগভূমিকে সুস্পষ্ট অতীতে কখনও পাই না। মূলত বংগ শব্দটি প্রাচীন-কালে জাতিবাচক ছিল, দেশবাচক নয়। ঋগ্বেদে বংগজাতির উল্লেখ আছে যারা আর্যদের যজ্ঞের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেনি। এই জাতির বসতি ছিল বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে। মহাভারতে একজন রাজার কথা আছে যার নাম ছিল 'বঙ'। এই 'বঙ' রাজাই সম্ভবতঃ বংগভূমির গোড়াপত্তন করেছিলেন। মার্কোপোলো তার ভ্রমণ কাহিনীতে বাঙালা অঞ্চলের কথা বলেছেন। কিন্তু মার্কোপোলোর বর্ণনাতে যে অঞ্চলের কথা ধরা পড়েছে সে অঞ্চলটি ব্রহ্মদেশের অঞ্চল বলে মনে হয়। এতে মনে হয় মার্কোপোলোর কিছুটা ভ্রম ঘটেছিল। এই ভ্রমের কারণ সম্ভবতঃ এই যে প্রাচীনকালে বংগ এলাকার কোন সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা ছিলনা। অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে সীমারেখার পরিবর্তন ঘটেছে এবং বংগ গোত্রের এবং জাতির মানুষ এ অঞ্চলে বসবাস করেছে। তবে ক্রমান্বয়ে ভাষার নির্দিষ্টকরণ যখন সম্ভবপর হল তখন থেকে ভাষার সাহায্যে বংগ অঞ্চলকে চিহ্নিতকরণ সহজতর হল। অর্থাৎ যে অঞ্চলের লোকেরা বাংলা ভাষায় কথা বলে তারাই বাংগালী এবং যে এলাকায় বসবাস করে সেটাই বংগ। দক্ষিণ এশিয়ার যে অঞ্চলের লোকেরা বাংলা ভাষায় কথা বলে সেই অঞ্চলের আদিম নামকরণ বংগ ছিল এটা সাব্যস্ত করা যায়। বর্তমানে ভারতের পশ্চিম বংগ এবং বাংলাদেশ এ দুটি অঞ্চলের ভাষা বাংলা। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বংগ সংস্কৃতি এ দুটি অঞ্চল নিয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। পাল রাজত্বকালে বিহারে যে সমস্ত ভাস্কর্য এবং চিত্রকলা গড়ে উঠেছিল সেগুলো বংগভূমিরই সংস্কৃতির প্রসার ছিল। সে সময়কালে এ সংস্কৃতি নেপাল, তিব্বত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রসারিত হয়েছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তর ভারত অনেকগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এগুলোর মধ্যে তিনটি প্রধান ছিল- মগধ, কোশল এবং বৎস। এই তিনটি ছিল বৃহৎ রাষ্ট্র। ক্ষুদ্র রাষ্ট্র অনেক ছিল যেমন কুরু, পাঞ্চাল, সুর সেন, কাশী, মিথিলা, অংগ, কলিংগ, কম্বোজ ইত্যাদি। জৈন সম্প্রদায়ের ভগবতী সূত্রে (ব্যাখ্যা প্রজ্ঞপ্তি) ষোলটি দেশের নাম আছে। এই ষোলটি দেশের মধ্যে বংগ নামক একটি দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈন শাস্ত্রে অংগ এবং বংগ এই দুটি দেশকে আর্য প্রভাবান্বিত দুটি প্রত্যন্ত অঞ্চল বলে গণ্য করা হয়েছে। মহাভারতে বর্ণিত অংগদেশ সম্ভবতঃ বিহারের ভাগলপুর এবং মুংগের নিয়ে গড়ে উঠেছিল। চম্পা নদী অংগ এবং মগধের

www.pathagar.com

মধ্যেকার সীমানা চিহ্নিত করেছিল। অংগদেশের উত্তরে গংগানদী প্রবাহিত হত। পদ্মার পশ্চিম তীরে অংগের রাজধানী চম্পা অবস্থিত ছিল, চম্পার পূর্ব নাম ছিল মালিনী। চম্পা ছিল মিথিল থেকে ৬০ যোজন দূরে। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র দীর্ঘ নিকায়ে চম্পাকে ভারতের ছটি প্রধান নগরের একটি বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এখান থেকে বাণিজ্যের জন্য ব্যবসায়ীরা সুবর্ণ ভূমিতে যেত। ভৌগোলিকভাবে বিবেচনা করলে বলা যায় যে পূর্বকালে যে অঞ্চলে বংগজাতির বসতি ছিল সে অঞ্চলে ডানে উত্তরে পার্বত্য এলাকায় ছিল প্রাগ জ্যোতিষ, শীর্ষে ছিল অংগ এবং তার উপরে ছিল পুণ্ড্র, সমতট ছিল বর্তমান সুন্দরবন এলাকা। তবে যে রকমই হোক সুস্পষ্টভাবে আমরা বংগভূমিকে প্রাচীনকালে বর্তমানের মত করে পাই না।

সমুদ্রতীরবর্তী বলে এবং গংগাবিধৌত বলে বংগভূমি চিরকাল উর্বর ছিল। কৃষি ছিল এখানকার মানুষের পরিচিত জীবিকা। উৎপাদিত শস্যের প্রাচুর্য প্রাচীনকালেও এ অঞ্চলকে পৃথিবীর কাছে প্রধান করেছিল। হিন্দু দেবী লক্ষ্মীর উৎপত্তি এই বংগভূমিতেই। লক্ষ্মী হচ্ছেন ঐশ্বর্যের প্রতীক। যেহেতু শস্যসম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল বংগভূমি সুতরাং সে দেশে লক্ষ্মীর বরাভয় ছিল। ভূমধ্যসাগর থেকে গংগা নদী ছিল বহু দূরে অবস্থিত। কিন্তু তা' সত্ত্বেও গংগার উল্লেখ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে একটি গ্রীক গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রীক দার্শনিক টলেমীর গ্রন্থেও দ্বিতীয় খ্রীষ্ট শতাব্দীতে গংগার উল্লেখ আছে। সেখানে গংগা ছাড়াও তাম্রলিপ্তি শহরের উল্লেখ আছে। তাম্রলিপ্তি হচ্ছে আধুনিক তামলুক পশ্চিম বঙ্গের রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত। এভাবে দেখা যায় যে সুস্পষ্ট ইতিহাসের রেখাঙ্কন না থাকলেও বংগভূমি সভ্য জগতের সংগে বহু প্রাচীনকালেই গ্রথিত ছিল। তাম্রলিপ্তি এবং গংগার উল্লেখ বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুধর্ম শাস্ত্রেও আছে।

মহাস্থানের পুণ্ড্র নগরে প্রাপ্ত একটি শিলালিখনে বংগ সভ্যতার কিছু পরিচয়লিপি পাওয়া যায়। শিলালিপিটি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের। মহাস্থান হচ্ছে বাংলাদেশের বগুড়া শহরে অবস্থিত। আর্য সভ্যতার সীমারেখার বাইরে একটি সুসমৃদ্ধ নাগরিক প্রশাসন প্রাচীন বংগ এলাকায় ছিল, শিলালিখনের দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। শিলালিখনটিতে একটি দুর্ভিক্ষের বিবরণ আছে। সরকার পক্ষ থেকে প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণকে দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের দুর্দশা লাঘবের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এভাবে আমরা দেখতে পাই সেই প্রাচীনকালে সমাজ হিতৈষণা এবং জনকল্যাণের কথা এ অঞ্চলের শাসকবৃন্দ চিন্তা করেছিলেন। বংগের উত্তরাঞ্চলে পুণ্ড্র দেশ সম্ভবতঃ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বংগভূমির সংস্কৃতি বংগের বাইরে ছড়িয়ে ছিল এটা যেমন সত্য তেমনি আবার বাইরের সংস্কৃতিও বংগভূমির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বগুড়ার মহাস্থানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির কাজের যে সমস্ত নিদর্শন আমাদের হাতে এসেছে তাতে দেখি যে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম এবং দ্বিতীয় শতকে সুংগশিল্প পদ্ধতির প্রভাব এ অঞ্চলে ছিল।

www.pathagar.com

ক্রমান্বয়ে বর্তমান বংগভূমির অধিকাংশ অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সময় উত্তর ও পশ্চিমবংগ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়। তখন সম্ভবতঃ সমতট এবং পূর্ববংগ করদরাজ্যে পরিণত হয়। ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ এ অঞ্চলে ঘটে সমুদ্রগুপ্তের পরে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে। সে সময় চীনা পরিব্রাজক ফাহিয়েন এ অঞ্চলে এসেছিলেন। ফাহিয়েনের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি যে এখানকার জনসাধারণ শান্তিপ্রিয় এবং স্বাধীনচেতা ছিল।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দেয় এসব অঞ্চলে। কিন্তু শশাংকের উদ্ভবের ফলে অল্প কিছুকাল মধ্যে এ অঞ্চলে শৃঙ্খলা আবার ফিরে আসে। শশাংক বৌদ্ধবিরোধী ছিলেন এবং সম্ভবতঃ শশাংকের হাতে বৌদ্ধরা অত্যাচারিতও হয়েছিল। হু-য়েন-সাংগ-এর বর্ণনায় শশাংককে বৌদ্ধবিরোধী শাসক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। শশাংকের মৃত্যুর পর বংগভূমিতে প্রায় একশত বছর পর্যন্ত অরাজকতা চলে। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে জনসাধারণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ অরাজকতা দূর করবার চেষ্টা করা হয়। জনসাধারণ অনুভব করলো যে দেশের একটি সুসংবদ্ধ কেন্দ্রীয় শাসন না থাকলে বিশৃঙ্খলা দূর করা সম্ভব হবে না। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রনেতাদের আবির্ভাব ঘটেছিল তারা আপন ক্ষমতা খর্ব করে সর্বসম্মতিক্রমে গোপাল নামক একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে তাদের রাজা নিযুক্ত করে। গোপালের জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্যে আমরা সহজেই এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে গোপাল এ অঞ্চলে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন এবং শক্তিশালী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিলেন। পাল রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম পুরুষ হিসাবে গোপালের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। গোপালের নামের শেষাংশটুকু তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের নাম হিসাবে চিরকাল পরিচিত হয়ে থাকবে। গোপাল থেকেই পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশ। গোপাল কোন্ বংশোদ্ভূত ছিলেন তা আমরা জানিনা, সম্ভবতঃ তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। গোপাল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তিব্বতী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে তিনি নালন্দা বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'রাম চরিত' নামক একটি কাব্যগ্রন্থে গোপালের পরিচয় সূত্রে বলা হয়েছে তিনি ছিলেন বরেন্দ্রী অর্থাৎ উত্তরবংগের বাসিন্দা। অবশ্য ঐতিহাসিক প্রমাণাদিতে বর্তমানে এটা প্রায় স্বীকৃত যে গোপালের দেশ ছিল বংগ বা বর্তমানে বাংলাদেশ। তারানাথের বর্ণনায় আমরা গোপালকে পুণ্ড্রবর্ধনের অধিবাসী বলে জানি। তারানাথ গোপালকে ক্ষত্রিয় বলেছেন। গোপালের পুত্র ধর্মপাল ছিলেন পাল বংশের সর্বপ্রধান নরপতি। গোপালের রাজত্বকাল ছিল ৭৫০ থেকে ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ। গোপালের পুত্র ধর্মপাল রাজত্ব করেন ৭৭০ থেকে ৮১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। সে সময় দুটি শক্তি পাল রাজবংশের বিরুদ্ধে উদ্যত ছিল। তাদের একটি হচ্ছে প্রতিহার অন্যটি হচ্ছে রাষ্ট্রকূট। উভয় শক্তি শস্য সম্পদে সমৃদ্ধ বংগভূমির দিকে দৃষ্টি রেখেছিল। প্রতিহার শক্তি ছিল রাজপুতানা এবং

www.pathagar.com

রাষ্ট্রকূট শক্তি ছিল দাক্ষিণাত্যের। প্রতিহারদের সংগে যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হয়েছিলেন। প্রতিহারগণ আবার রাষ্ট্রকূটগণের হাতে পরাজিত হয়। রাষ্ট্রকূটদের হাতেও ধর্মপাল প্রথমে পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধর্মপাল শক্তি সঞ্চয় করে পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ধর্মপালের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হতে থাকে। বংগ এবং বিহার সম্পূর্ণভাবে তার করতলগত ছিল। কনৌজের ওপরও তিনি অধিকার বিস্তার করেছিলেন। রাজপুতানা, মালওয়া, বেরার এবং পাঞ্জাব তার আয়ত্তে এসেছিল। নেপালও ধর্মপালের করদরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। ধর্মপাল কেদার এবং গোকর্ণ পর্যন্ত তাঁর প্রভাব বিস্তারিত করেন। গোকর্ণ সম্ভবতঃ বোম্বাই প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত। সুস্পষ্টভাবে এ কথা বলা যায় যে তৎকালীন ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী নৃপতি হিসেবে ধর্মপাল নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য ধর্মপালের রাজত্বকাল যে নিশ্চিত শান্তির ছিল তা বলা যায় না। কেননা মধ্যে মধ্যে কোনো কোনো প্রতিবেশী নৃপতি বিদ্রোহ করেছেন এবং ধর্মপালের প্রতিপক্ষ হিসাবে দণ্ডায়মান হয়েছেন। একসময় বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট চক্রায়ুধকে পরাজিত করে কনৌজ দখল করেন। চক্রায়ুধ ছিলেন ধর্মপালের আশ্রিত নৃপতি। তবে যাই হোক এ কথা সত্য যে ধর্মপাল একজন শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন। এক সময় যখন বংগভূমি দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিলো সে সময় তিনি অমিতবিক্রমে বংগভূমিতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। সর্বভারতের পটভূমিতে যে বংগভূমির অস্তিত্বই প্রায় ছিল না তাকে তিনি একটি প্রধান শক্তির মর্যাদা দান করলেন। এতদঞ্চলে অভ্যন্তরীণ যে বিরোধ ছিল এবং বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যে যুদ্ধমানতা ছিল ধর্মপালের চেষ্টায় তা বন্ধ হয় এবং পাল সাম্রাজ্য একটি শক্তিশালী শাসনতান্ত্রিক কাঠামোতে গড়ে উঠতে থাকে। শশাংক এক সময় একটি বৃহৎ গৌড় সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সে স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছিল ধর্মপালের রাজত্বকালে। ধর্মপাল যে সমস্ত উপাধি গ্রহণ করেন সে সমস্ত উপাধির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি শক্তির শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। তার উপাধি ছিল পরমেশ্বর, পরমভট্টারক এবং মহারাজাধিরাজ।

ধর্মপাল বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বলয় বিস্তারের জন্য আপ্রাণ সাধনা করেছিলেন। তিনি বিখ্যাত বিক্রমশীল বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন বিক্রমশীল পাহাড়ের উপর অবস্থিত গংগার তীরে মগধ অঞ্চলে। রাজশাহীর পাহাড়পুর অঞ্চলে যে সোমপুরী বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে সেটিও ধর্মপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ধর্মপালের রাজত্বকালে হরিভদ্র নামে বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন এবং ধর্মপালের সহায়তায় তিনি বৌদ্ধ ধর্মীয় ৫০টি বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তারানাথের মতে ধর্মপাল ৬৪ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। ৮১০ খ্রীস্টাব্দে ধর্মপালের পুত্র দেবপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। দেবপাল তার পিতার মতোই শক্তিশালী শাসক ছিলেন। সম্পূর্ণ উত্তর ভারত তাঁর পদানত হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে যে

www.pathagar.com

উত্তরে হিমালয় থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত তার সাম্রাজ্যের অধিকার বিস্তৃত ছিল। তিনি প্রাগ জ্যোতিষ জয় করেন, হূনদেরকে পরাভূত করেন। তার মন্ত্রীদের মধ্যে দুজনের নাম ইতিহাসে সুচিহ্নিত রয়েছে। এদের একজন হচ্ছেন দর্ভপাণি অন্যজন কেদার মিশ্র। হিমালয়ের উত্তরাপথে হূনদের অধিষ্ঠান ছিল। এই হূনদের অগ্রযাত্রাকে তিনি রুদ্ধ করেছিলেন। দেবপাল ৪০ বছর রাজত্ব করেন। তার পিতার মতো তিনিও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারে সহায়তা করেছিলেন। দেবপালের রাজত্বকালে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের একজন বৌদ্ধ নৃপতি বালপুত্রদেব দেবপালের দরবারে দূত প্রেরণ করেছিলেন। বালপুত্রদেব বালিন্দায় একটি বৌদ্ধ মঠ স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন। সমগ্র ভারতের ইতিহাসে বাঙালী জাতির এই আশ্চর্য উত্থান তুলনাহীন। ধর্মপাল এবং দেবপালের সময় সমগ্র ভারতে বংগভূমির প্রভাব ছিল অপরিসীম। এদের রাজত্বকালে আরব ব্যবসায়ীরা ব্যবসা সূত্রে বাংলাদেশে এসেছেন এবং বাংলাদেশের গৌরব কীর্তন করেছেন। সোলায়মান নামক একজন আরব ব্যবসায়ীর লিখিত বিবরণে পাল রাজত্বকালের সমৃদ্ধির বিবরণ আছে। তার বিবরণটি রচিত হয় ৮৫১ খ্রীস্টাব্দে। দেবপালের পরে বিগ্রহপাল সিংহাসন অধিকার করেন। বিগ্রহপাল সম্ভবতঃ দেবপালের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। কিন্তু কেউ কেউ আবার তাকে দেবপালের পুত্রও বলে থাকেন। বিগ্রহপাল বেশীদিন রাজত্ব করেননি। ৩ বছর রাজত্বকালের পরে তিনি প্রবজ্যা গ্রহণ করেন এবং ভিক্ষুকের জীবনযাপন করতে থাকেন। সিংহাসন ত্যাগের পর তার পুত্র নারায়ণপাল রাজ্যাধিপতি হন এবং প্রায় ৫০ বছর রাজত্ব করেন। বিগ্রহপালের সংসার ত্যাগের সময় থেকেই পাল রাজত্ব ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকে। নারায়ণপালের সময় রাষ্ট্রকূটগণ শক্তিশালী হয় এবং প্রতিহারগণও শক্তিশালী হতে থাকে। নারায়ণপাল মগধের অধিকার হারিয়ে ফেলেন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত নৃপতিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আসামে হরজর নামক একজন সামন্ত নৃপতি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এক কথায় বলতে গেলে পাল সাম্রাজ্যের প্রভাব বলয় সংকুচিত হতে হতে শুধুমাত্র বংগভূমিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। নারায়ণপালের মৃত্যু হয় ৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে। মৃত্যুর কিছু পূর্বে বংগ এবং বিহারে তিনি তার রাজত্ব সুসংহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নারায়ণপালের মৃত্যুর পর তার পুত্র রাজ্যপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যপালের পরে দ্বিতীয় গোপাল এবং দ্বিতীয় বিগ্রহপাল আরো ৮০ বছর রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপাল ৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথম মহীপালের সময় পাল রাজত্ব আবার পূর্ব প্রভাব ফিরে পায় এবং মহীপালের পর আরো ১৫০ বছর পর্যন্ত পাল রাজত্ব পূর্ণ প্রত্যয়ের সংগে বিদ্যমান ছিল।

পাল রাজত্বকালে বহির্ভারতের একটি শক্তি বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়েছিল। এই শক্তি ছিল ইসলামের শক্তি। যখন কান্যকুব্জে প্রতাপশালী হর্ষবর্ধন রাজত্ব করছিলেন সে সময় ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আরবসেনা কর্তৃক ইরানের প্রতাপী সাসানী

www.pathagar.com

রাজবংশের উচ্ছেদ ঘটে। এর ১৩ বছর পূর্বে আরবসেনা মধ্য এশিয়ার তুখারিস্তান পর্যন্ত উপনীত হয়েছিল। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন লিখেছেন যে আরবরা শুধু আপন শাসন স্থাপনের জন্যই দিগ্বিজয় করেননি বরঞ্চ বিজিত দেশে আপন বিশ্বাস এবং সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন।

এর ফলে সম্ভবতঃ প্রচণ্ড সংঘর্ষ বিভিন্ন স্থানে হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয়ী আরব সেনার পরাক্রমকে কেউ রোধ করতে পারেনি। তুখারিস্তান ছিল বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি প্রাচীন কেন্দ্র। বলখ এবং তিরমীজ– তুখারিস্তানের এ দুটি স্থানে অনেক বৌদ্ধ বিহার ছিল। গৌতম বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র বলখের একটি মন্দিরের মধ্যে সুরক্ষিত ছিল। রাহুল সাংকৃত্যায়নের অভিমত এই যে, নালন্দা, বিক্রমশীল এবং সোমপুরী বিহারে তুখারিস্তান থেকে শ্রমণরা আসতো এবং শিক্ষা গ্রহণ করতো। সুতরাং তুখারিস্তানে আরবদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেই সংবাদ বংগভূমিতেও এসেছিল এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও চর্চায় ইসলামের প্রভাব পড়া বিচিত্র নয়। ধর্মপালের রাজত্বকালে মহাপণ্ডিত এবং কবি সরহপার আবির্ভাব ঘটে। সরহ তার দোহাকোষে ব্রাহ্মণ্যবাদের আচারের বিরুদ্ধে অনেক মন্তব্য করেছেন। তিনি আনুষ্ঠানিক ধর্মার্চনাকে প্রশ্রয় দেননি এবং সর্বভূতে বিরাজমান যে শক্তি সেই শক্তির চর্চা করেছেন। রাহুল সাংকৃত্যায়নের অভিমত এই যে, খুব সুস্পষ্ট না হলে গৌণভাবে ইসলামের প্রভাব বংগভূমিতে মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ শ্রমণদের সাহায্যে এসেছিল। আমরা জানি যে অষ্টাদশ শতকে সিন্ধু প্রদেশ আরবদের করতলগত হয়। ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক-পুত্র ওলিদের সেনাপতি সিন্ধু বিজয় করেন এবং তখন থেকে চিরকালের জন্য সিন্ধুদেশ মুসলমানদের অধিকারে থাকে। একদিকে মোহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু দেশ দখল করেন, অন্যদিকে ওলিদের অন্য একজন সেনাপতি কুতৈব বিন মুসলিম বক্ষু এবং সির নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। ৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে বোখারা মুসলমানদের করতলগত হয়। ৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব তুর্কীস্তানে ইসলাম উপনীত হয়, এর ফলে মধ্য এশিয়ায় হাজার হাজার বৌদ্ধ সংঘারাম বিলুপ্ত হয়। যখন মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হচ্ছে তখন বংগভূমিতে পাল সম্রাটদের প্রতিপত্তি সুসংহত হচ্ছে। রাহুল সাংকৃত্যায়নের বিচার মতে মধ্য এশিয়ার শ্রমণ এবং বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ নালন্দা, বিক্রমশীল ইত্যাদি বিদ্যাপীঠে আগমন করেন এবং সমগ্র পৃথিবীতে বৌদ্ধ চিন্তার এবং গবেষণার কেন্দ্রভূমি হয় বংগভূমি।

বর্তমানে বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আদর্শগত পরিপ্রেক্ষিত অনুসন্ধান করতে গেলে বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান করা প্রয়োজন; যে অতীত কালের পরিপ্রেক্ষিতে সুস্পষ্টভাবে কয়েকটি পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবে বিভক্ত হয়। প্রথম পর্যায়ে একটি অস্ফুট বিপর্যস্ত সময়ের ধারাক্রম লক্ষ্য করি যে সময়ে সমতট এবং বংগ অঞ্চলে আর্যদের অনুপ্রবেশ সম্ভবপর হয়নি। আর্যরা আর্যাবর্তের

www.pathagar.com

বাইরে, বাইরের অঞ্চল হিসাবে বংগভূমিকে ম্লেচ্ছ ভূমি বলে বিবেচ্য করতো এবং আর্যাবর্তের কোন লোক বঙ্গভূমিতে গেলে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাকে শুদ্ধি হতে হতো। অথবা বলা যায় প্রায়শ্চিত্য করতে হতো। বিভিন্ন সময়ে এ অঞ্চলে আর্যদের অধিকার সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও আর্যরা এদেশবাসীর কাছে বহিরাগত হিসেবে গণ্য হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ অষ্টম শতক থেকে স্থানীয় পাল রাজবংশ বংগভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দ্বাদশ শতক পর্যন্ত এদের অধিকার বিদ্যমান ছিল। শেষের দিকে অবশ্য এ অধিকারের খর্বতা এসেছিল। দীর্ঘকালের অধিকারের ফলে এ অঞ্চলে বৌদ্ধ চিন্তা এবং নীতিবোধ প্রবলভাবে সক্রিয় হয়। পাল রাজবংশের সময়ে আনুষ্ঠানিক পূজা এবং ধর্মালোচনা প্রশ্রয় পায়নি। সরহপা যে তত্ত্ববাদের প্রতিষ্ঠা ঘটালেন সেটা হচ্ছে সহজ এবং মুক্ত জীবনের।

সরহপা তাঁর 'দোহাকোষ-চর্যাগীতি'র প্রথম বারোটি দোহায় তাঁর সময়কালের ধার্মিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিচারকে খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেনঃ 'যদি নগ্ন হলেই মুক্তি আসে তাহলে কুকুর এবং শৃগালইতো যথার্থ মুক্ত। ময়ূরের পাখা গ্রহণ করলেই যদি মোক্ষ আসে তাহলে ময়ূর এবং চমরইতো মোক্ষ লাভের অধিকারী। শিলা চুম্বন করলেই যদি জ্ঞান লাভ হয় তাহলে তো করী এবং তুরংগ সর্বতোভাবে জ্ঞানী'। সরহপার নিজস্ব ভাষায়–

জই ণগগাবিঅ হোই মুক্তি,
তা সুণহ সিআলহ।
লোমুপাড় ণে অস্থি সিদ্ধি,
তা জুবই ণিঅম্বাহ।
পিচ্ছীগহণে দিট্ঠ মোক্ষ,
তা মোরহ চমরহ।।

অনেক পরে কবীরের দোহায় একই ভাবের অভিব্যক্তি ঘটেছে ঃ

কা নাংগে কা বাঁধে চাম
জৌ নহি চীহ্নসি আতমরাম।
নাংগে ফিরে জোগ জে হোঈ
বনকা মৃগ মুকতি গয়া কোঈ
মুণ্ড-মুণ্ডায়ে জৌ সিধি হোঈ
স্বর্গহি ভীড় ন পহুঁচী কোঈ।

সরহ বলেছেন যে যথার্থ সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন সঙ্কল্প ও অসঙ্কল্পের সমন্বয়, করুণা শূন্যতা এবং শুধুই করুণার সতীর্থতা, ধ্যান ও ধ্যানহীনতার একত্রতা। তাহলেই সহজ-স্বভাবের উজ্জীবন ঘটবে। তাঁর ভাষায় ঃ

করুণা-রহিঅ জো সুন্নণি লগগা।

www.pathagar.com

ণউ সো পবঈ উত্তিম মগগা।।
অহবা কেবল করুণা সাহঅ।
জন্মসহস্সহি মোক্খ ণ পাবঅ।।
জই পুন বেণ্ণবি জোড়ণ সক্কঅ।
ণউ ভব ণউ নিব্বাণে থাক্কঅ।।

সরহপা চিত্তকে সকল অস্তিত্বের বীজ স্বরূপ গণনা করেছেন, ভব নির্মাণ চিত্ত থেকেই বিকশিত হয়। কর্ম মানুষকে বন্ধন করে, কর্মবিমুক্ত হলেই মনমুক্ত হয়। তিনি আরো বলেছেন, ইন্দ্রিয় যখন বিলীন হয় তখনই আত্মস্বভাব বিনষ্ট হয়। আত্মস্বভাব বিনষ্ট হলেই একজন সাধক সহজানন্দ তনুলাভ করে। যেখানে মানুষের ইচ্ছায় মৃত্যু ঘটে অথবা যখন মানুষের ইচ্ছায় মৃত্যু ঘটে তখন অথবা সেখানে সে পরম মহাসুখ লাভ করে। এভাবে সরহপা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর জ্ঞানকে প্রকাশ করেছেন।

বৌদ্ধ নীতিবোধের সংগে সংগে ইসলামের প্রভাব এ অঞ্চলে এসেছিল। ইসলামের প্রভাব এসেছিল দু'ভাবে– আরব বণিকদের প্রত্যক্ষভাবে এবং দ্বিতীয়তঃ মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ শ্রমণদের দ্বারা গৌণভাবে। আরব বণিকরা ব্যবসা সূত্রে বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং তারা পাল রাজত্বের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি লক্ষ্য করেছিলেন। সেই সময় কিছু মুসলমান সাধকও এদেশে এসে থাকবেন, এটা ধারণা করা যায়। সুতরাং এ কথা বলা অসমীচীন হবে না যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই বাংলা সংস্কৃতি এবং জাতিসত্তার উদ্ভব এবং প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। যেমন বৌদ্ধ প্রতাপ এবং প্রভাব তেমনি ইসলামের প্রভাব তেমনি হিন্দু ধর্মের প্রভাব। ঋগ্বেদের সময় থেকে অনেকটা অস্পষ্টভাবে বংগভূমির অস্তিত্ব স্বীকৃতি থাকলেও মূলতঃ বৌদ্ধ পাল সম্রাটগণের সময় একটি সুসংহত ভৌগোলিক সীমারেখায় বংগভূমি সুচিহ্নিত হয়। আমরা ভাষার সাহায্যে এটা প্রমাণ করতে সক্ষম হবো যে, এ অঞ্চলের মানুষের একটু স্বতন্ত্র উচ্চারণবিধি এবং ব্যাকরণ প্রক্রিয়ায় পূর্বাঞ্চলীয় প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ অবশেষে একটি স্বতন্ত্র ভাষাসত্তায় পরিণত হয়।

বর্তমানে এটা সর্বজনস্বীকৃত যে বংগ ভূ-ভাগে যখন বিশৃংখলা বিরাজমান ছিল এবং মাৎস্যন্যায় প্রচলিত ছিল তখন পাল সাম্রাজ্য সে অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সর্বদেশে স্বস্তি ও সম্ভ্রম ফিরিয়ে আনে। সংস্কৃতির নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় এবং প্রজ্ঞা ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ঘটে। ধর্মক্ষেত্রে সাধনবিদ্যার পরিচর্যার জন্য নালন্দা বিহার স্থাপিত হয়। ধর্মপালের সময় ওদন্তপুরীতে একটি বিহার স্থাপিত হয়। ধর্মপাল প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রে আগ্রহী সাধক ছিলেন এবং সেই সূত্রের ব্যাখ্যাকল্পে তিনি বিভিন্ন বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন। এই সমস্ত বিদ্যাপীঠ ভবন এবং বিভিন্ন বিহার বিশেষ স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন বহন করে। পোড়ামাটিতে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য এ সময়কার

www.pathagar.com

শিল্পচর্চার নিদর্শন বহন করে। আমরা বাংলাদেশের ময়নামতিতে এ সমস্ত পোড়ামাটির কাজের নিদর্শন পেয়েছি। পূর্বেই বলেছি পাল সাম্রাজ্য একটি সম্মানিত এবং শক্তিশালী প্রতাপী রাজবংশের অনুশাসনে পরিচালিত হত যাদের গৌরবময় পরিচয় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। দেবপালের রাজত্বকালে সুমাত্রা থেকে বৌদ্ধ রাজের দূত বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন। এই দূতের কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এর নাম ছিল বলদেব পুত্র। ইনি সুমাত্রার শৈলেন্দ্র সম্রাটের প্রতিনিধি ছিলেন। বর্তমানে প্রাপ্ত বিভিন্ন নিদর্শনের মধ্যে সে সময়কার কালো পাথরের মূর্তি আমরা পাই এবং তালপাতার কিছু পাণ্ডুলিপি পাই। সেসব পাণ্ডুলিপিতে সুন্দর রংগীন চিত্র রয়েছে। সম্রাট মহীপাল সিংহাসনে বসেন ৯৮৮ খ্রীস্টাব্দে। একটি লোকগাঁথার মধ্যে মহীপালের প্রশংসাগীতি পাওয়া যায়। পাল রাজত্বের সর্বশেষ সম্রাট ছিলেন রামপাল। রামপালের রাজত্ব ছিল ১০৮২-১১২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। রামপালও যে একজন বিদগ্ধ নৃপতি ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সময় রচিত 'অষ্টসহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা'র পাণ্ডুলিপিতে। এই পাণ্ডুলিপি বর্তমানে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। রামপালের মৃত্যুর ২০ বছর পরে যে সম্রাটের সন্ধান আমরা পাই তার নাম মদনপাল। মদনপাল সম্ভবতঃ ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। একটি পুরনো মূর্তির পাত্রে পালপাল বলে একজন রাজার পরিচয় আছে। কিন্তু তার সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। পাল রাজবংশের পতনের পর কয়েকটি হিন্দু রাজবংশের উত্থান এবং পতন আমরা লক্ষ্য করি। একটি রাজবংশ ছিল বর্মণ রাজবংশ। বর্মণ রাজবংশের পতনের পর চন্দ্র রাজবংশের আবির্ভাব ঘটে। অবশেষে সেন রাজবংশকে আমরা পাই। এ সময়কালটি বংগভূমির জন্য একটি বিভ্রান্তির কাল। যে সংহতি এবং সৌভাগ্যের নিদর্শন আমরা পাল রাজত্বকালে দেখেছিলাম তার কণামাত্রও আর অবশিষ্ট ছিল না। শিক্ষা ক্ষেত্রে, ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং শিল্প চর্চার ক্ষেত্রে পাল সম্রাটগণ যে অতুলনীয় সমৃদ্ধির স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন পরবর্তী বিক্ষিপ্ত হিন্দু শাসনে তার পরিচয় মাত্র ছিল না। সেটা সম্ভবপরও ছিল না, তার কারণ পাল রাজবংশের শেষের দিকে একাদশ শতক থেকেই বর্মণ এবং চন্দ্র রাজবংশের সংগে পালদের সংঘর্ষ ঘটছিল। এ সমস্ত সংঘর্ষের ফলে পাল রাজত্ব সংকুচিত হয়ে শুধুমাত্র পূর্ব ও দক্ষিণ বংগের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিতি নিয়েছিল। বর্মণ, চন্দ্র এবং সেন রাজবংশের মধ্যে সেন রাজবংশই তুলনামূলকভাবে অধিকতর ক্ষমতাশালী ছিল এবং তাদের রাজত্বও কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী ছিল। সেন রাজবংশের বিজয় সেন রাজত্ব করেন ১০৯৭ থেকে ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বৌদ্ধ মতবাদে আপ্লুত বংগভূমিতে তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটান। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন এ অঞ্চলে সংস্কৃত চর্চার ভিত্তিভূমি স্থাপন করেন। বল্লাল সেনের রাজত্বকাল ১১৭৮ থেকে ১২০৬। লক্ষ্মণ সেন ছিলেন বিষ্ণুর ভক্ত। লক্ষ্মণ সেনের সময়ই দক্ষিণ

www.pathagar.com

ভারতের বিখ্যাত সাধক রামানুজ উড়িষ্যায় আসেন। রামানুজের প্রভাবে কবি জয়দেব সুললিত সংস্কৃত ভাষায় গীতগোবিন্দ রচনা করেন। গীতগোবিন্দের মধ্যে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হয়েছে। গীতগোবিন্দে কৃষ্ণ ছিলেন বিষ্ণুর প্রতীক। এ সময়কার একটি ঘটনা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সম্মিলিত হিন্দু শক্তি পাঞ্জাবে মোহাম্মদ ঘোরীর হাতে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হয় এবং ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সেনাপতি মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর আগমন সংবাদ পেয়ে লক্ষ্মণ সেন নদীয়া থেকে পলায়ন করেন। বখতিয়ার খিলজী লক্ষ্মণাবতী দখল করেন। লক্ষ্মণাবতী ছিল গৌড়ের রাজধানী। তুর্কী বিজয়ের পর বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং বংগ সংস্কৃতিতে আমূল পরিবর্তন আসে। যেখানে এক সময় হিন্দু এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির বলিষ্ঠ প্রভাব ছিল সেখানে ইসলামী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটলো।

পালরা ছিলেন বংগদেশবাসী বৌদ্ধ। কিন্তু সেনরা ছিলেন কর্ণাটকবাসী বহিরাগত। বিজয় লালসায় অগ্রসর হয়ে তারা বংগভূমিতে তাদের অধিকার বিস্তার করেছিলো। এদেশবাসী সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের ঘৃণা ছিল অদম্য। বহু পূর্বে আদিশূর কাণ্যকুব্জ থেকে ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন এবং আর্যাবর্তের বর্ণাশ্রম ধর্ম সেই সংগে বংগ ভাষাভাষী অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলো। আদিশূরের সময়কার ব্রাহ্মণরা এদেশে জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত করল এবং তখন থেকে নিম্নবর্ণের মানুষ অবহেলিত হতে থাকল। কিন্তু আদিশূরের সময়কার ব্রাহ্মণদের প্রতাপ পূর্বেকার বংগ এবং সমতট অঞ্চলে তেমন প্রবেশ করেনি। পাল রাজত্বকালে আমরা দেখি ব্রাহ্মণও শূদ্র হচ্ছে, আবার শূদ্রও সুযোগ এবং প্রয়োজন বুঝে ব্রাহ্মণ হচ্ছে। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় জাতিভেদের প্রতাপ বংগভূমিতে প্রাধান্য পায়নি। সরহপা নিজে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, পরে বৌদ্ধ হয়েছিলেন, অবশেষে কাপালিক রমণীর সংগ করে শূদ্র হয়েছিলেন। সমাজে কিন্তু তিনি লাঞ্ছিত কিংবা পরিত্যক্ত হননি, কেননা তখন এ অঞ্চলের লোকেরা বর্ণাশ্রমকে মেনে নেয়নি। সেনদের আমলে বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রবল প্রতাপে বংগভূমিতে আত্মপ্রকাশ করে। লক্ষ্মণ সেন ব্রাহ্মণ আনলেন বর্ণাটক থেকে এবং কাণ্যকুব্জ থেকে এবং ব্রাহ্মণদের ভাষা বিধায় সংস্কৃত ভাষাকে রাজভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন। পাল রাজত্বকালে পূর্ব অপভ্রংশ এ অঞ্চলের সকল মানুষের গৃহীত ভাষা ছিল। এ অপভ্রংশ ছিল সাধারণ মানুষের ভাষা, তাদের প্রতিদিনের উচ্চারণের ভাষা। সেন রাজারা সে ভাষার চর্চা রুদ্ধ করলেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজদরবারে সংস্কৃত কবি এবং পণ্ডিতরা প্রশ্রয় পেলেন। এদের মধ্যে আচার্য গোবর্ধন একজন দরবারী কবি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'আর্যা সপ্তশতী' রচনা করেন। বর্তমানে এ গ্রন্থটি দুর্লভ। বিখ্যাত প্রাকৃত কাব্য 'গাঁথা সপ্তশতী' অনুকরণ করে তিনি 'আর্যা সপ্তশতী' রচনা করেন। নিশ্চয় রাজ নির্দেশে এ কাজ তিনি করেছিলেন।

www.pathagar.com

কেননা যখন সাধারণ মানুষ প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ভাষাকে অবলম্বন করে আনন্দিত হচ্ছে তখন সংস্কৃত ভাষায় গোবর্ধন কার জন্য এ কাব্য রচনা করলেন? সে সময়কালে সংস্কৃতের কোন অবলম্বন বংগ ভূ-খণ্ডে ছিল না। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের উদ্দেশ্য ছিলো এ অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করা। লক্ষ্মণ সেনের মাতৃভাষা এতদঞ্চলের ভাষা ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে তিনি সংস্কৃতকে অবলম্বন করেছিলেন। মুসলমানরা যেমন এদেশে আগমনের পর ফার্সী ভাষাকে রাজভাষা করেছিলেন সেন রাজারাও তেমনি সংস্কৃতকে রাজভাষা করেছিলেন। তবে মুসলমানদের সংগে সেন রাজাদের পার্থক্য ছিল এখানে যে, মুসলমানরা আরবীকে রাজভাষা করেননি। এমন একটি ভাষাকে তারা রাজভাষা করেছিলেন যে ভাষা অত্যন্ত সহজে আয়ত্ত করা যায় অর্থাৎ ফার্সী ভাষা। সেনরা একটি বিপরীত পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছিলেন। তারা এ অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন এবং মানব অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন। তা না হলে বহিরাগত সংস্কৃত ব্রাহ্মণ এনে এদেশবাসীর চৈতন্যের উপর আঘাত করতেন না। লক্ষ্মণ সেনের দরবারের আরেকজন কবি জয়দেব। তিনিও গোবর্ধনের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। জয়দেব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, জয়দেব হচ্ছেন ভোগের কবি এবং ইন্দ্রিয় বিলাসের কবি। জয়দেবের মধ্যে শারীরিক ভোগাসক্তির প্রশ্রয় আছে। এই ভোগাসক্তির সাহায্যে জয়দেব বাংলা কবিতায় একটি নতুন ধারার জন্ম দেন। বৈষ্ণব কাব্যধারা জয়দেবের অংগীকারেই এদেশে জন্মলাভ করে। সরহপার সময়ে চর্যাগীতিকা সাধারণ মানুষের বিশ্বাস এবং জীবন চৈতন্যকে অবলম্বন করে যে ভাবে গড়ে উঠেছিল জয়দেব এবং গোবর্ধন তার বিপরীতধর্মী কাব্য রচনা করে এদেশের কাব্যধারায় পরিবর্তন সাধন করেন। এদেশের সাধারণ মানুষ সেন রাজাদের আমলে যে নির্যাতিত ছিল চর্যাগীতিকার বহু পদে তার প্রমাণ আমরা পাই। ব্রাহ্মণরা নগরে বাস করতেন এবং নিম্নবর্ণের মানুষকে ব্রাহ্মণদের দৃষ্টির আড়ালে নগরের বাইরে বাস করতে হত। ইখতিয়ারউদ্দীন বখতিয়ার খিলজী সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে যে বংগভূমি জয় করেছিলেন এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কেননা উৎপীড়িত নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ ইখতিয়ারউদ্দীন খিলজীকে স্বাগত জানিয়েছিল এবং রাজধানীর লৌহ কপাট খুলে দিয়েছিল। ইখতিয়ারউদ্দীন এদেশে প্রবেশ করেছিলেন সাধারণ মানুষের ত্রাণকর্তা হিসাবে।

যে অঞ্চল নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত সে অঞ্চলের মানুষ একটি মিশ্র জাতিসত্তা। বিভিন্ন জাতি উপজাতি এখানে এসে মিলিত হয়েছে। আমরা যদিও সুস্পষ্টভাবে এসব জাতির উদ্ভব এবং ক্রমবিকাশ নির্ণয় করতে পারিনা কিন্তু বাংলা ভাষার

www.pathagar.com

ধারাক্রম পরীক্ষা করলে আমরা বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর পরিচয় এই ভাষার মধ্যে নির্ণয় করতে পারি। ভাষাগতভাবে যে সমস্ত জাতিসত্তা বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া যায় সেগুলো ৪টি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (ক) তিব্বতী-বর্মী, (খ) অস্ট্রো-এশীয়, (গ) দ্রাবিড়, (ঘ) ইন্দো-আর্য। তিব্বতী-বর্মী গোত্রের মধ্যে দুটি ভাষাধারা পাওয়া যায়–কুকী-চীন এবং গাড়ো-ত্রিপুরী। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের ভাষা কুকী-চীন গোত্রভুক্ত। এসব ভাষা ব্রহ্মদেশের ভাষার সংগে সম্পর্কিত; দ্বিতীয় গোত্র হচ্ছে গাড়ো-ত্রিপুরী ইত্যাকার ভাষা, সেগুলো বাংলাদেশের উত্তর এবং উত্তর পূর্ব-পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ী এলাকায় প্রচলিত। অস্ট্রো-এশীয় গোত্রের মধ্যে দুটি ভাষার প্রাধান্য দেখা যায়, তার একটি হচ্ছে খাসি, যেটা সিলেটের উত্তরাঞ্চলে পাওয়া যায়, বিশেষ করে ভারতের মেঘালয় অঞ্চলে। দ্বিতীয় হচ্ছে মুণ্ডা ভাষা। ভারতে প্রায় ১ কোটি লোক এ ভাষায় কথা বলে। অতীতে এই ভাষাগোত্রের কিছু লোক বংগ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল তার ফলে এই ভাষার কিছু নিদর্শন বাংলা ভাষার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এভাবে আমরা দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীরও কিছু নিদর্শন বাংলা ভাষায় খুঁজে পাই। চতুর্থ পর্যায়ের ভাষাগোষ্ঠী হচ্ছে ইন্দো-আর্য। এটাই মূলতঃ বাংলা ভাষার ভিত্তিভূমি।

বিভিন্ন ভাষার প্রভাব বাংলা ভাষার মধ্যে পড়েছে এবং সে ভাষার কিছু কিছু নিদর্শন আমরা বাংলা ভাষার উচ্চারণের মধ্যে পাই, বিভিন্ন স্থানের নামের মধ্যে পাই, সংখ্যা গণনার মধ্যে পাই, এবং ব্যাকরণ বিধির মধ্যে পাই। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯৩১ সালে তাঁর একটি প্রবন্ধে প্রমাণ করেন যে বাংলা ভাষায় মুণ্ডা ভাষার প্রভাব রয়েছে (Munda Affinities of Bengali; Proceedings of the Sixth Oriental Conference, Patna 1931, pp. 715-21)। সম্প্রতি এ নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন ক্ল্যারেন্স মেলোনি নামক একজন আমেরিকান পণ্ডিত (Tribes of Bangladesh and Synthesis of Bengali Culture. Tribal Cultures of Bangladesh, Institute of Bangladesh Studies Rajshahi University, 1984, pp. 5-52)।

মুণ্ডা ভাষার সংগে বাংলা ভাষার যে সব মিল আছে তার কিছু নিদর্শন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দেখিয়েছেন এবং মেলোনীও আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে ঃ

১. মুণ্ডা ভাষার লিংগভেদ নেই যেমন বাংলাতে সাধারণতঃ নেই। ২. মুণ্ডাতে বহুবচনের সুস্পষ্ট নিদর্শন নেই। বহুবচন বুঝাতে বাংলাতে যেমন আমরা একজন মানুষ, দুইজন মানুষ বলি, মুণ্ডাতেও তেমনি। ৩. মুণ্ডাতে বাংলার মতোই স্বরধ্বনির লঘু-গুরু নেই। ৪. বাংলা ভাষায় চার বুঝাতে আমরা 'হালি' বলি, বিশ

www.pathagar.com

বুঝাতে 'কুড়ি' বলি এবং আশি বুঝাতে 'পণ' বুঝি। এই 'হালি', 'কুড়ি', এবং 'পণ' মুণ্ডা শব্দ। ৫. বাংলাতে টা, টি এবং গুলি ব্যবহার হয়, যেমন একটা, দুইটি, অনেকগুলি ইত্যাদি। এগুলো ইন্দো-আর্য ভাষায় নেই। মুণ্ডা ভাষার প্রভাবে বাংলার এই প্রভাবটা এসেছে এবং বাংলা ভাষার বহুল পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পণ্ডিতবর্গ এই সিদ্ধান্তে আসতে সক্ষম হয়েছেন যে, বাংলা সরাসরি কখনও সংস্কৃত থেকে আসেনি। মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ স্বরূপের বিবর্তনে ক্রমান্বয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব এবং এর মধ্যে মুণ্ডার প্রভাবও রয়েছে। গ্রাম্য জীবনে এখনো যে সমস্ত শব্দ আমরা ব্যবহার করি সেগুলোর কোন কোনটা মুণ্ডা শব্দ যেমন হাল (লাংগল), গংগা (পানি অথবা নদী অর্থে), আণ্ডা, পাড়া (গৃহ অর্থে)।

বাংলাদেশ অঞ্চলে আদিবাসীদের সংখ্যা একেবারে নগণ্য নয়। ১৯৮১ সালের গণনায় মোট ১০ লক্ষের মতো আদিবাসী এখানে আছে এটা আমরা ধরে নিতে পারি। এই আদিবাসীদের মধ্যে যারা কুকী-চীন গোত্রভুক্ত তারা মূলতঃ চট্টগ্রাম পার্বত্য এলাকায় বেশীর ভাগ বসতি করে। এদের মধ্যে চাকমা গোত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এ কারণে যে তারা বর্তমানে শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত এবং আধুনিক সভ্যতার সংগে ওতপ্রোত হয়েছে। এরা একসময় কুকী-চীন ভাষায় কথা বলত কিন্তু বর্তমানে এরা যে ভাষায় কথা বলে তার মধ্যে চট্টগ্রামী বাংলার আঞ্চলিকতাটাই প্রধান। এ ভাষা বর্মী হরফে লিখিত হয়। আমরা এ ভাষাকে ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ধরে নিতে পারি। চাকমাদের অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। মারমা বলে আর একটি উপজাতি আছে। এদের সংখ্যা দেড় লক্ষের অধিক। এরা আরাকানের অধিবাসী ছিল একসময় এবং 'মারমা' ভাষা ছিল ধর্মীয় একটি উপভাষা। এ ভাষাও বর্মী হরফে লিখিত হয়। এদের বাংগালীরা 'মগ' বলে উল্লেখ করে থাকে। 'মণিপুরী' বলে একটি শিল্পকুশলী উপজাতি বাংলাদেশে আছে। এরা শ্রীহট্টে মৌলভী বাজার অঞ্চলে বসবাস করে। ভারতের মণিপুর রাজ্যে এদের মূল বাসভূমি। শ্রীহট্ট অঞ্চলে যে সমস্ত মণিপুরী আছে তারা ভারত থেকে কোন একসময় শ্রীহট্টে এসেছিলো এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে থেকে গেছে। বর্তমানে এদের উপজাতি বলা সঙ্গত নয়, কেননা শিক্ষা সংস্কৃতিতে এরা সমৃদ্ধশালী হয়েছে। এরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং এদের অধিকাংশই বৈষ্ণব। ভারতের মৈথিলী ভাষার একটি ভ্রষ্ট রূপে এরা কথাবার্তা বলে। আর একটি উপজাতি 'মুরং' বলে পরিচিত। এরা সভ্যতার আলোক পুরোপুরি পায়নি, এরা এখনো যাযাবর এবং ঝুম চাষ করে জীবন যাপন করে। 'মিজো' বলে আর একটি উপজাতি আছে। এদের অধিকাংশ ভারতের মিজোরামে থাকে, কিছু সংখ্যক মিজো ব্রহ্মদেশে থাকে,

www.pathagar.com

চট্টগ্রামে থাকে। এদের ভাষা হচ্ছে লুসাই। এরা খৃষ্টান ধর্ম অবলম্বন করেছে এবং খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকদের উৎসাহে রোমান হরফে এদের ভাষার একটি লিখিত রূপ গড়ে উঠেছে। 'কুকী' বলে আর একটি উপজাতি আছে। এদের বেশীরভাগ লোক রাঙামাটি অঞ্চলে থাকে এবং এদের ভাষার কোনো লিখিত রূপ নেই। কুকী-চীন জাতির ছোটোখাটো আরো অনেক উপশাখা আছে তবে সেগুলো তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তিব্বতী-বর্মী ভাষা গোষ্ঠীর একটি বিভাগ হলো 'অসম-বর্মী'। এই 'অসম-বর্মী' গোত্রের একটি গোত্র হচ্ছে 'বোড়ো'। এই 'বোড়ো' গোত্রের মধ্যে গাড়ো, কাহারী, মেখ, রাঙা ইত্যাদি বিভিন্ন গোত্র আছে। এরা সবাই 'বোড়ো' ভাষার বিভিন্ন রূপে কথা বলে। বাংলাদেশ অঞ্চলের সংস্কৃতি এক প্রকার মিশ্র সংস্কৃতি। নির্ভেজাল রূপে প্রতিপাদ্য একক কোনো জাতিসত্তার সংস্কৃতি নয়। আধুনিককালে সংস্কৃতি এবং জাতিসত্তা হচ্ছে এক প্রকার সমন্বিত বোধ। একক জাতিসত্তার কল্পনা করা অথবা আবিষ্কার করা একটি অসম্ভব ব্যাপার। হিটলার বিশুদ্ধতম এক জাতিসত্তার সন্ধান করেছিলেন যার ফল হয়েছিল মারাত্মক এবং মানবতার জন্য দুর্বিসহ। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আমরা আর্য, অনার্য এবং সেমেটিক এবং আরো অনেক জাতির সংমিশ্রণে তৈরী একটি বিচিত্রধর্মী জাতি। বাংলা ভাষাভাষীর যে অঞ্চল পশ্চিমবংগকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে সে অঞ্চলের মানুষ সাধারণভাবে ভাষাগত সূত্রে আমাদের সংগে একাত্ম হলেও জাতিগত সূত্রে আমাদের স্বভাবের নয়।

বাংলাদেশের জাতিসত্তা নির্ধারণের ঐতিহাসিক সূত্রে আমরা প্রথমে পরিশীলীত রূপে বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও চিন্তাকে পাচ্ছি। এই সংস্কৃতি এবং চিন্তার মধ্যে যে আবেগগুলো গৃহীত এবং বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত তা হচ্ছে, প্রথমতঃ গণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য; দ্বিতীয়তঃ মানুষে মানুষে সাম্য এবং শ্রেণীবিভেদ রহিত অবস্থা; তৃতীয়তঃ মানবতাবোধ এবং পরমত সহিষ্ণুতা; চতুর্থতঃ যা কিছু সুন্দর এবং কল্যাণকর তা গ্রহণ করার আগ্রহ। আমরা পাল রাজত্বকালের উন্মেষ এবং ক্রমবিকাশের ধারা পর্যালোচনা করলে এ সত্যগুলি আবিষ্কার করতে সক্ষম হব। বহিরাগত সেনরা বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রবর্তন করবার চেষ্টা করলেও এদেশের মাটিতে তা শিকড় গাড়তে পারেনি। সেনদের আমলে ব্রাহ্মণদের প্রধান বিচরণক্ষেত্র ছিল বর্তমান পশ্চিমবংগের বিভিন্ন এলাকা। সংস্কৃত টোল এবং বিদ্যাপীঠের অধিকাংশেরই অবস্থান ছিল পশ্চিমবংগে। সামগ্রিকভাবে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের সংস্কৃত শিক্ষার ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করি তাহলে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া শান্তিপুরকেই সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র আখ্যা দিতে হয়। বর্ণাশ্রম ধর্মের আনুকূল্যের জন্য যে সমস্ত সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ গড়ে উঠেছিল সেগুলোর প্রায় সবটাই

www.pathagar.com

ছিল পশ্চিমবংগে। সেনদের সাংস্কৃতিক প্রভাব বলয় বর্তমান বাংলাদেশের অঞ্চলে বিস্তার লাভ করতে পারেনি। এদেশে সেনদের অবস্থানকাল ছিল অল্প দিনের। পালরা রাজত্ব করেছিল সাড়ে চার শো বছর। সেনরা রাজত্ব করেছিল পঁচাত্তর বছর এবং তার পরে মুসলমানদের শাসনকাল ছিল পালদের মতো দীর্ঘ সাড়ে চার শো বছর। মুসলমানদের শাসন আমলে এদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিপুল পরিবর্তন আসে। ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক অংগনে শ্রেণীভেদ বিলুপ্ত হয়, নতুন দু'টি ভাষার স্বভাব এবং বিবেচনার প্রক্রিয়া এদেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে, স্থাপত্য শিল্প নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করে এবং পোষাক পরিচ্ছদ এবং খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতিতে বিপুল পরিবর্তন আসে। বৌদ্ধরা অবলুপ্ত হলেও তাদের বিশ্বাসের প্রকল্পগুলো মুসলমানদের আনীত সংস্কৃতির সংগে মিশে গিয়েছিল। বর্তমান বাংলাদেশের জাতিসত্তার স্বরূপ নির্ধারণ করতে গেলে ইতিহাসের এই ধারাক্রমটি স্মরণে রাখতে হবে।

পাকিস্তান আমলে 'পাকিস্তান' নামক ভূখণ্ডের একটি ভৌগোলিক সত্তা রাজনৈতিকভাবে নির্ধারিত হলেও তা সকল মানুষের অনুভবগম্যতার মধ্যে আসেনি। পাকিস্তান আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার দরুন এর ভৌগোলিক সত্তা কেমন যেন গৌণ হয়ে পড়ে। তাছাড়া ভৌগোলিক সত্তা নির্ধারণের জন্য যে প্রকরণগুলো প্রয়োজন সে প্রকরণগুলোর সবটা বিদ্যমান ছিল না। যেমন অঞ্চলগত সংলগ্নতা ছিল না, ভাষাগত ঐক্য ছিল না, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভিন্ন ভিন্ন রকম ছিল। শুধুমাত্র ধর্মীয় ঐক্য এবং প্রশাসনগত ঐক্য বিদ্যমান ছিল। পাকিস্তানের সামগ্রিক ইতিহাসে দেখা গেল যে জাতিসত্তা নির্ধারণের জন্য এ দু'টিই যথেষ্ট নয়। যেখানে এ পৃথিবীতে ভাষাগত ঐক্য এবং ধর্মীয় ঐক্য থাকা সত্ত্বেও আরব জাতি বহু ভৌগোলিক জাতিসত্তায় পরিণত হয়েছে, সেখানে শুধুমাত্র ধর্মের কারণে এবং নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনের কারণে একটি পাকিস্তানী জাতি গড়ে উঠা কি করে সম্ভবপর? ১৯৫২ সাল থেকেই এ অবাস্তব ঐক্যের মধ্যে ভাংগন দেখা দেয়, এবং অবশেষে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জাতিগত সত্তা হিসেবে আমরা বাংগালী বলে চিহ্নিত হয়েছিলাম এবং দেশগত সত্তা হয়েছিল বাংলাদেশ। সে সময় এ উভয় সত্তার সমন্বয় করা হয়নি। অর্থাৎ আমরা বাংগালী এ কথাই বলা হয়েছিল কিন্তু কোন সূত্রে বা রেফারেন্সে বাংগালী সে কথা এখন সুস্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশী জাতীয়তা

১

আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদ শব্দটি একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি কিন্তু পুরোপুরি জাতিসত্তার সঙ্গে জড়িত নয়। প্রধানত দেশসত্তার দিক থেকে জড়িত। বিদেশে আমাদের পরিচয় বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে, ভারতবাসীর পরিচয় ভারতের নাগরিক হিসেবে, পাকিস্তানবাসীর পরিচয় পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে। এই পরিচয় অলংঘনীয় এবং এর উপর নির্ভর করেই আমরা নিজেদের ভাবমূর্তি সুস্পষ্ট করতে পারি। পাকিস্তানে অনেক জাতিসত্তা আছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাখতুনরা এবং সিন্ধু প্রদেশের সিন্ধীরা দুটি ভিন্ন ভিন্ন জাতি। কিন্তু পাকিস্তানের পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের দেশগত জাতিসত্তা একই। ভারত ভূ-খণ্ডের ক্ষেত্রে এটা অধিকতর সত্য। ভারতের দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অবস্থিতি, উত্তরাঞ্চলের আর্যদের সঙ্গে এদের কোন মিল নেই। কিন্তু সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিকভাবে ও আন্তর্জাতিকভাবে এরা উভয়ই ভারতের নাগরিক। ইউরোপে আমরা লক্ষ্য করছি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা অনেক আছে। রাজনৈতিকভাবে ভাংচুর হয়ে এগুলো বর্তমানে সুস্পষ্ট দেশগত জাতিসত্তায় পরিণত হয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়ায় নৃ-তত্ত্বগত দুটি জাতিসত্তার অবস্থিতি ছিল। বর্তমানে চেক ও শ্লোভাক নামক দুটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের বিভক্ত হয়ে এরা আপন আপন জাতিসত্তাকে সুস্পষ্ট করেছে– একটি চেক জাতি, অন্যটি শ্লোভাক জাতি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মানব সম্পদ পৃথিবীর বহু অঞ্চল থেকে এসেছে। এদের অনেকে নিগ্রো, অনেকে সার্বীয়, অনেকে জার্মান, অনেকে আইরিশ এবং আরও অনেক জাতি। কখনও কখনও এদের নিজস্ব আদি জাতিসত্তার অনুসন্ধান হয় এবং এরাও আপনাপন মূল জাতিসত্তার ঐতিহ্য এবং স্বভাবকে আবিষ্কার করতে চায়। কিন্তু বর্তমানে দেশগত ও আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে এরা সকলে অনিবার্যভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমেরিকান। এরা সকলেই একই দেশের ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধি ও উন্নতি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে এবং একই দেশের সংরক্ষণ ও সম্মাননার চিন্তায় একটি একক আশা এবং আকাঙ্ক্ষার দায়ভুক্ত। অর্থাৎ এদের জীবনে দেশগত সত্তাটি অগ্রাধিকার পাচ্ছে। জাতিগত সত্তা নয়। আমেরিকায় দীর্ঘকাল ধরে যে একটি জাতিগত মিশ্রণের প্রক্রিয়া চলছে, সেই মিশ্রণের প্রক্রিয়ায় আমেরিকার সব মানুষ একটি দেশের নাগরিক হিসেবে চিন্তায়, আকাঙ্ক্ষায় এবং আশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ। এই ঐক্যবদ্ধতা জাতিসত্তার অপরিহার্য অঙ্গ।

আরব দেশগুলোর দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে জাতিসত্তার পরিচিতিটি আরও সুস্পষ্ট হয়। মিসরীয়রাও আরব, সুদানীরাও আরব, ইরাকীরাও আরব,

www.pathagar.com

সিরিয়রাও আরব, সৌদীরাও আরব। কিন্তু তারা কি শুধুমাত্র আরব হিসেবে পরিচিত? যদিও কয়েকবার চেষ্টা হয়েছে জাতিগত আরব ঐক্য সাধনের কিন্তু তা সফলকাম হয়নি। আবদুন নাসেরের সময় একটি চেষ্টা হয়েছিল আরব ঐক্য সাধনের এবং ভৌগলিকভাবে সব ক'টি আরব দেশকে একত্রীকরণের। সে সময় একজন বিখ্যাত আরব ঐতিহাসিক ডঃ কসটি জোরায়েক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, গ্রন্থটির নাম- "নাহনু ওয়া তারীখ"। অর্থাৎ আমরা এবং ইতিহাস। এ গ্রন্থের মধ্যে তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন যে আরবরা দেশগতভাবে ভিন্ন হলে, মূলত তারা এক ও অভিন্ন। নাসেরের আদর্শের সমর্থন এ গ্রন্থে ছিল। কিন্তু কার্যত দেখা গেল যে এভাবে জাতিসত্তার ঐক্যসাধন করা সম্ভবপর হচ্ছে না। কেননা ভৌগলিক নিবাস এবং অধিকার নিয়ে একটি জাতি যদি স্বাধীনভাবে রূপলাভ করে তাহলে সে জাতি তার ভৌগলিক সত্তাকে বড় করে তুলে ধরতে চায়। এই ভৌগলিক সত্তার মধ্যে একেকটি জাতির ঐতিহ্যগত সমৃদ্ধির সমর্থন আছে। মিসরের প্রাচীন ঐতিহ্য হচ্ছে পিরামিডের যুগের ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমান মিসরের ইসলামের সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক তাতে কিছু যায় আসে না। মিসরের সমস্ত লোক পিরামিডের যুগের ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক। সেগুলো নিয়েই তাদের গর্ব। সুতরাং মিসরীয়রা মূলতঃ আরব জাতিসত্তা হওয়া সত্ত্বেও মিসরীয় হিসেবেই চিহ্নিত ও গর্বিত থাকতে চায়। তেমনি আমরা ইরাকেও লক্ষ্য করি যে, ইরাকের প্রাচীন অতীত খৃষ্ট-পূর্ব সময়ের অনেক পিছনে চলে যায়। ইরাকীরা এ ঐতিহ্যকে সম্মানের সঙ্গে স্মরণে রেখেছে এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বে ইরাকীরা ইরাকী নাগরিক। আরব বলে তাদের পরিচয় থাকলেও তারা বহির্বিশ্বে কখনও যদি আরব হিসেবে পরিচিত হয় তাহলেও ইরাকী আরব হিসেবে পরিচিত হবে। এভাবে উদাহরণ আরও বাড়ানো যেতে পারে। মূলকথাটি হল যে, জাতিসত্তাকে দেশসত্তার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখাই নিয়ম এবং কর্তব্য। যদি তা না করা হয় তাহলে দেশের প্রতি আনুগত্য খর্ব হয় এবং একসময় দেশসত্তার অস্তিত্বে আঘাত আসতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে যারা বাস করে তারা বঙ্গভাষী এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক প্রয়োজনে তারা বাঙালী। কিন্তু দেশসত্তায় তারা ভারতীয়। তাদের মধ্যে কেউ কখনও নিজেদেরকে ভারতীয় সত্তার বহির্ভূত বলে মনে করে না। এরকম মনে করলে তাদের সমূহ বিপদ। ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে, ঐতিহ্যের সঙ্গে, উন্নয়নের সঙ্গে এবং ভারতের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধতা প্রকাশের ক্ষেত্রে তারা এক এবং অভিন্ন। অর্থাৎ তারা ভারতীয়। এদের মধ্যে অনেকে বাংলাদেশে মাঝে মাঝে আসেন এবং বাঙালীত্বের সাজুয্যে কিছু কিছু বাংলাদেশীর সঙ্গে একটি জাতিগত সত্তায় মিলিত হচ্ছেন বলে উল্লাস প্রকাশ করেন। কিন্তু এরাই যখন আবার পশ্চিমবঙ্গে ফিরে যান তখন আর বাঙালী থাকেন না, ভারতীয় হয়ে

www.pathagar.com

যান। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে একশ্রেণীর অমেরুদণ্ডী বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক আছেন যারা নিজেদেরকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে একাত্ম করে বাঙালী বলে ঘোষণা দেন। এরা এক অর্থে মানসিক বিকারগ্রস্ত। কখনও কখনও নিজেদের বাঙালী বলেই ক্ষান্ত হন তাই নয়, তারা স্পষ্ট বলে থাকেন যে, তারা বাংলাদেশী নন, বাঙালী। তাদের এই উক্তিটি দেশদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের রাজনৈতিক নীতিমালার মধ্যে বাংলাদেশী এবং বাঙালী শব্দ দুটি জুড়ে দিয়ে জাতীয়তাবাদকে একটি সমস্যায় পরিণত করেছেন। এর ফলে একটি দল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হচ্ছে। অপর একটি দল বাঙালী জাতীয়তাবাদের অর্থ বহন করে বিবদমান হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে। এভাবে জাতীয়তাবাদকে রাজনৈতিক দলের চৌহদ্দীর মধ্যে এনে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে দেশদ্রোহিতার জন্ম হওয়া যেন স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে। বিশ্বের সর্বত্রই যখন দেশগত সত্তায় জাতিসত্তার চিহ্নিতকরণ চলছে সেখানে বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগত সংঘর্ষ ও বিরোধিতায় দেশগত সত্তা বিপর্যস্ত হচ্ছে। এ অবস্থার আশু সমাধান প্রয়োজন।

২

নানারকম অবস্থান থেকে জাতীয়তাবাদের নানারকম সংজ্ঞা দেয়া যেতে পারে এবং সে সমস্ত সংজ্ঞা সত্য বলে মনেও হতে পারে। কিন্তু এসব সংজ্ঞার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন কর্মে অগ্রসর হলে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা বেশী থাকে। অনেকে ধর্মকে জাতীয়তাবাদের উৎস বলে মনে করেন। ধর্মকে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ঘটনা একমাত্র ভারতবর্ষেই ঘটেছে। তার ফলে অনেক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছে এবং রক্তপাত ঘটেছে। হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মগত বিচারে দুটি ভিন্ন সম্প্রদায়। কিন্তু তাদের এই ভিন্নত্ব তাদের মধ্যে মানবিক এবং দেশগত বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং একটি দেশের সামগ্রিক জাতীয়তাবোধের চেতনার মধ্যে ধর্মেরও অংশ আছে বলে ধরে নিতে পারি, কিন্তু ধর্মটাই সম্পূর্ণ নয়। ধর্মের কারণে পারিবারিক সম্পর্কে অথবা সামাজিক সম্পর্কে কিছুটা বিশিষ্টতা জন্মে এটা সত্য এবং ধর্মের কারণে পোষাক-আষাক ও খাদ্য স্বভাব এবং মানুষে মানুষে দৃশ্যমান রূপেরও পরিবর্তন ঘটতে পারে। আফ্রিকার দেশগুলোর দিকে তাকালে আমার কথাগুলোর তাৎপর্য বোঝা যাবে। আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলে সেনেগাল নামক একটি দেশ আছে। এদেশের প্রায় শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মুসলমান। কিন্তু এদেশটিকে যিনি প্রথম একটি স্বাধীন সত্তা দিলেন তিনি একজন খ্রীষ্টান। ফরাসীদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর সেনেগালের রাষ্ট্রনায়ক হলেন লিওপোল্ড সেডার সেঙ্ঘর। ইনি বিশ বছর পর্যন্ত

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং সেনেগালের লোকে তাকে খ্রীষ্টান হিসেবে দেখেনি। তাকে দেখেছে নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে।

উগান্ডা একটি মুসলিম সংখ্যালঘু দেশ। কিন্তু এই উগান্ডার রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন ইদি আমিন, একজন মুসলমান। একসময় এদেশটি বৃটিশের অধীনে ছিল এবং বৃটিশদের ভয়াবহ অত্যাচারের কথা তারা মনে রেখেছিল। দেশ স্বাধীন হবার পরও সে দেশের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বৃটিশদেরই একচেটিয়া অধিকারে ছিল। ইদি আমিন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার দেশ থেকে বিদেশীদের তাড়ালেন এবং কতকগুলো প্রতীকগত আচরণের মধ্য দিয়ে বৃটিশদের অপমানিতও করলেন। যেমন প্রতিষ্ঠিত এবং সম্মানিত কিছু ইংরেজদের কাঁধে চড়ে তিনি ঘুরে বেড়ালেন। এসব অপমান সহ্য করা ইংরেজদের সম্ভবপর হয়নি। তাই তারা একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইদি আমিনকে উৎখাত করলেন। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার ধর্মের অধিকারে নয় ইদি আমিন তার দেশগত বা জাতিসত্তার অধিকারে উগান্ডাকে বলিষ্ঠ করতে চেয়েছিলেন। নাইজেরিয়ার ঘানাও অবিকল তাই। নাইজেরিয়া প্রধানত একটি মুসলমান দেশ। নাইজেরিয়ায় ইসলাম প্রবেশ করেছিল খ্রীষ্টীয় নবম শতকে। নাইজেরিয়ায় আবার খ্রীষ্টানরাও একটি প্রধান অংশ। তাছাড়া দেশের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে কিছু আদিম বিশ্বাসের লোকজন আছে। ধর্মবিশ্বাস নাইজেরিয়ার জাতিসত্তা নির্ধারণ করে না। তাই আমরা দেখি যে এক সময় নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান একজন খ্রীষ্টান হয়েছিলেন। মূলত দেশগত তাৎপর্যেই সে দেশের জাতিসত্তা নির্ধারিত হয়েছে। ধর্মগত তাৎপর্যে নয়। নাইজেরিয়ায় এক সময় ধর্মগত সংকট দেখা দিয়েছিল। নাইজেরিয়ার বায়াফ্রা নামক প্রদেশের নেতা উজুকু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। বায়াফ্রা ছিল খ্রীষ্টানপ্রধান দেশ এবং তখন নাইজেরিয়ায় প্রেসিডেন্ট ছিলেন একজন খ্রীষ্টান ইয়াকুবু গাওগান। বায়াফ্রায় এক বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বহু মানুষ হতাহত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত উজুকু পলায়ন করেন। দেখা যাচ্ছে যে নাইজেরিয়ায় ধর্মগত জাতিসত্তা পরাজিত হয়েছে দেশগত জাতিসত্তার কাছে। বর্তমানে পাশ্চাত্য জগতের ষড়যন্ত্রে এবং কুচক্রে সুদানে একটি গৃহযুদ্ধ চলছে। সুদানের দক্ষিণাঞ্চলের খ্রীষ্টান সম্প্রদায় পাশ্চাত্যের অস্ত্রের সাহায্যে একটি দীর্ঘমেয়াদী গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সুদানী সরকার এদেরকে দমন করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য জগত বিশেষ করে ব্রিটিশরা সুদানের কেন্দ্রীয় সরকারকে মৌলবাদী বলে আখ্যায়িত করে দক্ষিণের খ্রীষ্টানদেরকে সাহায্য করে যাচ্ছে। সুদান কিন্তু যথার্থ অর্থে মৌলবাদী দেশ নয়। তারা আফ্রিকার ট্রেডিশন অনুসারে একটি দেশগত ব্যাপক সত্তায় সুদানকে আবদ্ধ রাখতে চাচ্ছে। মোট কথা দেশগত সত্তার বিকল্প নেই এবং দেশগত সত্তার পরিপ্রেক্ষিতেই একটি দেশের অস্তিত্ব, অন্য কোনওভাবে দেশের সত্তা বেঁচে থাকে না। সে কারণে খ্রীষ্টীয় সত্তা,

www.pathagar.com

মুসলিম সত্তা বা হিন্দু সত্তার সাহায্যে একটি দেশের অস্তিত্ব কখনও রূপ পাবে না। ভারতে বর্তমানে হিন্দু মৌলবাদীদের জাগরণ ঘটেছে। এরা ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। এখানে হিন্দুত্বটি একটি মৌল রাজনৈতিক উপাদান হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু এই আন্দোলনটি সফলকাম হবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। তার কারণ, এ আন্দোলনের সফলতার ফলশ্রুতিতে ভারত খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যেতে পারে। ভারতে দেশগত ঐক্য সম্পাদনের যে চেষ্টা স্বাধীনতার পর থেকে চলে আসছে সে চেষ্টা বিনষ্ট হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। ভারতের মুসলমানরাও তা জানে। তাই তারাও ভারতকে অস্বীকার করে অন্য দেশে উদ্বাস্তু হতে চাচ্ছেন না। তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে ভারতের দেশগত অস্তিত্বের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে ফেলতে চাচ্ছেন। এটাই সমীচীন।

এক সময় অবশ্য হিন্দু-মুসলমান বিরোধিতার ভিত্তিতে ভারত দ্বি-খণ্ডিত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ধর্মগত জাতিবোধ সমস্যার সৃষ্টি করেছে, সমস্যা দূর করতে পারেনি। এটা বুঝতে পেরে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সাংবিধানিক সভায় ঘোষণা করেছিলেন যে, আজ থেকে পাকিস্তানের মুসলমানরা মুসলমান হিসেবে পরিচিত হবে না, হবে পাকিস্তানী হিসেবে। তেমন হিন্দুরাও এবং খৃষ্টানরাও। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ একটি দেশগত সত্তায় সমস্ত পাকিস্তানকে একত্রিত করতে চেয়েছিলেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে যে সত্যটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে সেটি হচ্ছে আমাদের দেশগত সত্তা। আমরা বাংলাদেশী এটাই আমাদের প্রধান পরিচয়। পাকিস্তান আমলে এ পরিচয়টি আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। বিরাট ভৌগোলিক পার্থক্যের কারণে সমস্ত পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা একত্র হতে পারিনি। আজ আমরা একটি সামগ্রিক ভৌগোলিক অস্তিত্ব পেয়েছি। এই ভৌগোলিক অস্তিত্বই আমাদের দেশগত অস্তিত্ব। আমাদের জাতিসত্তা এই ভৌগোলিক অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশের মানুষে মানুষ নৃ-তাত্ত্বিক বিভাজন থাকবেই, ধর্মগত পার্থক্য থাকবেই, কিন্তু দেশগত সীমানায় আমরা একক এবং অনিবার্যরূপে বাংলাদেশী। এ কথাটি যারা ভুলে যাবার চেষ্টা করেন তাঁরা দেশদ্রোহের ইন্ধন আনেন এবং পার্শ্ববর্তী দেশের প্রেক্ষাপটে নিজেদেরকে অত্যন্ত পরাভূত এবং নির্জীব মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেন।

৩

পাকিস্তান আন্দোলনের সময় আমাদের উপমহাদেশে জাতিসত্তা নিয়ে একটি বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। বিতর্কটি পরে একটি সিদ্ধান্তে পরিণত হয়, যার ফলশ্রুতিতে অবশেষে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ঘটে। তখন বলা হয়েছিল যে জাতিগতভাবে উপমহাদেশের মুসলমানগণ হিন্দুদের থেকে ভিন্ন, ভাষাগত দিক

www.pathagar.com

থেকে হিন্দু এবং মুসলমান এক হলেও মুসলমানদের ব্যবহৃত শব্দ-সম্ভারের মধ্যে বহু আরবী-ফারসী শব্দ আছে এবং হিন্দুদের মধ্যে আছে সংস্কৃত। এছাড়া মুসলমান ও হিন্দুদের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোও এক রকম নয়। মুসলমানদের বিবাহ পদ্ধতি এক রকম, হিন্দুদের অন্য রকম। তাছাড়া ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ভিন্নতা তো আছেই। সে সময় আবেগ ছিল অনেক প্রবল। একটি সংঘর্ষের মুহূর্তে ভিন্নতাবোধও একটি প্রবল আবেগ সৃষ্টি করে। আমরা তখন সেই আবেগের শিকার হয়েছিলাম। সমগ্র ভারতে মুসলমানরা ছিল দুর্বল পক্ষ–শিক্ষায় অনগ্রসর এবং অর্থনৈতিকভাবে হিন্দু মহাজন দ্বারা শোষিত। সেহেতু সে সময়কালে বিত্তের অধিকারটা ছিল প্রধানত হিন্দুদের এবং বিত্তহীন ছিল মুসলমান। তাই রাজনৈতিকভাবে মুসলমানরা যখন বুঝতে শিখলো যে তারা মুসলমান বলেই শোষিত হচ্ছে তখন তারা হিন্দুদের বিপরীতে একটি ভিন্ন জাতিগত অস্তিত্ব আবিষ্কার করবার চেষ্টা করতে লাগল। এভাবেই আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমানের মনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এবং সংঘর্ষে রূপ লাভ করে, অবশেষে দেশটি বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিভাজন নিয়ে এখানে আমি আলোচনা করছি না। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই বিভাজনটি এমন দুটি জাতিগত কল্পনায় গড়ে উঠেছিল যা পরবর্তীতে অবাস্তব বলে প্রমাণিত হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তান আন্দোলনের সময় মুসলমান জাতিসত্তার কথা বারবার বললেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়ক হয়ে সর্বপ্রথম যে ভাষণ দিয়েছিলেন সে ভাষণে দেশগত জাতিসত্তার উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে পাকিস্তানের অধিবাসীকে পাকিস্তানী বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন, মুসলমান বা হিন্দু অথবা খ্রীষ্টান হিসেবে নয়। জিন্নাহ সাহেব তার জীবদ্দশায় এই জাতিসত্তা নির্মাণ করে যেতে পারেননি। কেননা জাতিসত্তা গঠনের যে সমস্ত বিশেষ শর্ত থাকে সমগ্র পাকিস্তানে তার অভাব ছিল। এ শর্তগুলির একটি হচ্ছে ভৌগোলিক অখণ্ডতা। সমগ্র পাকিস্তানের একটি ভৌগোলিক অখণ্ডতা ছিল না। পূর্ব পাকিস্তান ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন একটি অঞ্চল। জাতিসত্তার অন্য একটি শর্ত হচ্ছে নৃ-তত্ত্বগত একতা। সে ঐক্য পাকিস্তানের ছিল না। তৃতীয় শর্ত ছিল ভাষাগত ঐক্য। সে ঐক্যও পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানে নৃ-তত্ত্বগত এবং ভাষাগত ভিন্নতা থাকলেও সমষ্টিগতভাবে একটি প্রবল ভৌগোলিক অখণ্ডতা ছিল। এ ভৌগোলিক অখণ্ডতাই পশ্চিম পাকিস্তানকে একত্রিত করে রেখেছে। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে অতীত কাল থেকে বিভিন্ন জাতির আবির্ভাব ঘটেছিল। গ্রীকরা এসেছিল, শকরা এসেছিল, আর্যরা এসেছিল, মধ্য এশিয়া থেকে তুর্কীরা এসেছিল এবং এ রকম অনেক জাতিসত্তার প্রবেশ ঘটেছিল। সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানে কোন একক জাতিসত্তা গড়ে উঠতে পারেনি। সেখানে একটি মিশ্র জাতিসত্তা তৈরী হয়েছিল। অনেকে বলে থাকে যে

www.pathagar.com

সিন্ধীরা একটি স্বতন্ত্র জাতি, কথাটি ঠিক নয়। সিন্ধুতে এক সময় দ্রাবিড়দের বসতি ছিল, পরে আর্যদের বসতি ঘটলো, তারপরে এল আরবরা। এ ধরনের মিশ্রণ পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলেও ঘটেছে। তাই আমরা বলতে পারি যে সামগ্রিকভাবে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন বিশেষ উপকরণ সিন্ধীদের ছিল না। তাই পশ্চিম পাকিস্তানকে জাতিগতভাবে একটি একক বলা যায়। প্রধানত ভৌগোলিক সত্তার সমর্থনে সেখানে একটি একক দেশগত সত্তা নির্মিত হয়েছে যাকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের একক একটি সত্তা গড়ে উঠতে পারেনি। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাই তার একমাত্র কারণ। পাকিস্তান আমলে জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছিল, যার চেষ্টা ছিল পাকিস্তানের সমগ্র অঞ্চলকে একটি একক সমষ্টিতে পরিণত করা। কিন্তু এটা হতে পারেনি। কেননা ইংরেজীতে আমরা যাকে বলি মিশ্রণ, পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সে মিশ্রণ ঘটেনি। যাই হোক সে ভিন্ন একটি ইতিহাস।

পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগোলিক, নৃ-তাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত কোনরূপ সমন্বয় সাধিত হয়নি। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একমাত্র বন্ধন ছিল ধর্মীয় বন্ধন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্য যে ধর্মীয় বন্ধন উভয় অঞ্চলের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস নির্মাণ করতে সক্ষম হয়নি। পারস্পরিক বিশ্বাসটি আসে ত্যাগ এবং সহানুভূতি এবং সমর্থন থেকে। এগুলো উভয় অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ছিল না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ধর্মগত জাতিসত্তা এক অলীক ভাবনায় পর্যবসিত হয়েছিল। যার ফলে শেষ পর্যন্ত একটি একক দেশগত জাতিসত্তা গড়ে উঠতে পারেনি। পূর্বেই বলেছি ভৌগোলিকভাবে এটা অসম্ভব ছিল। এটা সম্ভব হতে পারত যদি প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক বিলি ব্যবস্থায় উভয় অঞ্চল নিজ নিজ বৃত্তে পূর্ণাঙ্গরূপে স্বায়ত্তশাসিত থাকত। কিন্তু প্রথম থেকেই পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ কেন্দ্রীয় শাসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল এবং প্রাদেশিক শাসনগুলোকে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল করে তুলেছিল। এর কারণ তারা প্রদেশগুলোকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না; বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানকে তারা বিশ্বাস করতে পারেননি। পাকিস্তানের সূত্রপাতেই এ অবিশ্বাসটি ধরা পড়েছিল। কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রথম সুযোগে ঢাকা এসেই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং তার আগমনের পরপরই প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সহানুভূতি না দেখিয়ে এ দাবিগুলোকে ঘৃণ্য প্রাদেশিকতা বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতি ক্রমশঃ বিরূপ হতে আরম্ভ করে। তারা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে যে সমগ্র পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান

www.pathagar.com

একটি বিপন্ন অবস্থায় পড়েছে এবং তার অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। এভাবেই তথাকথিত পাকিস্তানী জাতিসত্তার প্রতি এ অঞ্চলের মানুষের কোনরূপ সমর্থন গড়ে উঠতে পারেনি।

আমরা দেখছি যে, পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ধর্মীয় জাতিসত্তা ভৌগোলিক জাতিসত্তায় রূপান্তরিত হতে পারেনি। বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ বস্তুগতভাবে এবং অনুভূতিভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হল যে জাতিসত্তার একটি প্রবল ভৌগোলিক সমর্থন প্রয়োজন। বর্তমান বাংলাদেশে আমরা এই ভৌগোলিক সত্তাটি পেয়েছি। পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলটি প্রাচীনকাল থেকেই পূর্ববঙ্গীয় অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। আবহাওয়ার দিক থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, নৃ-তাত্ত্বিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। আর্যদের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চল অষ্টম শতক থেকেই আর্যাবর্তের বাইরে ছিল। এখানকার মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই আর্যদের যজ্ঞের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিল। অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বৌদ্ধ পাল শাসনামলে এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চল একটি স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অস্তিত্ব। সীমারেখার অল্প কিছু হেরফের হলেও পাল আমলের সীমারেখার সঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশের সীমারেখার তাৎপর্যগত মিল আছে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ভাষাগতভাবে আমাদের সঙ্গে অভিন্ন হলেও তারা কখনও কোনও উপলক্ষে আমাদের সঙ্গে একীভূত হতে চায়নি। সেখানকার মানুষ বিরাট ভারতীয় সত্তার একটি অংশ এবং সেই হিসেবেই তাদের অস্তিত্বগত গৌরব।

আমাদের গৌরব খুঁজতে হবে আমাদের সীমারেখার মধ্যে। দেশগত সত্তাকে আমাদের অস্তিত্বের মৌল উপাদান করে আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে বাংলাদেশী হতে হবে। আমাদের অস্তিত্বের এই দেশজ প্রকৃতি সম্মানের সঙ্গে সুরক্ষিত না থাকলে আমাদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। যারা আজ নিজেদেরকে বাঙালী বলে চিহ্নিত করতে চান তারা কোন্ অর্থে এবং কোন্ তাৎপর্যে যে এটা চান তা আজও আমার কাছে বোধগম্য হল না। কোনও জাতি তারা নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় নিয়ে তাদের ভৌগোলিক বেষ্টনীকে অস্বীকার করতে পারে না। আমাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতিই হচ্ছে আমাদের দেশগত স্বীকৃতি, এই দেশগত স্বীকৃতিতে আমরা বাংলাদেশী।

www.pathagar.com

আমাদের আত্মপরিচয়

আমি একটি ভূখণ্ডের অধিবাসী, সে ভূখণ্ডের নাম বাংলাদেশ। এই ভূখণ্ডের মধ্যে স্থায়ীভাবে যারা বসবাস করেন, তারা ভূখণ্ডগত অধিকারে বাংলাদেশের নাগরিক। তাদের মধ্যে বহুবিধ বৈচিত্র্য আছে, দেহ-বর্ণের পার্থক্য আছে, আকৃতিগত দীর্ঘতা এবং খর্বতা আছে, উচ্চারণগত পার্থক্য আছে, ধর্মীয় অনুশাসনগত ভিন্নতা আছে, তবুও তারা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে একটি বিশিষ্ট ভূখণ্ডগত ভৌগোলিক বেষ্টনীতে চিরকালের জন্য আবদ্ধ থাকার দরুন বাংলাদেশী। একটি দেশের অধিবাসীদের দেশগত পরিচয়টিতে সবসময় জাতিগত পরিচয় বুঝায় না। আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডে, প্রশাসনিক নীতি-নির্ধারণে, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনার ক্ষেত্রে এবং বিশ্বের পটভূমিতে আত্মপরিচয়ের সুনিশ্চয়তার জন্য আমাদের দেশগত পরিচয়টাই প্রধান পরিচয়। এই দেশগত পরিচয়েই আমরা বাংলাদেশী। এই দেশগত পরিচয়টাই একসময় জাতিসত্তায় পরিণত হয়।

নৃ-তত্ত্ববিদদের বিচারে বাংলাদেশের মানুষ একটি মিশ্রিত জাতিসত্তার অধিকারী। তাদের নির্ভেজাল কোন কৌলিন্য নেই। বহু যুগ ধরে এ অঞ্চলে নানাবিধ জাতির আগমন ঘটেছে। তাদের কোন্‌টি প্রবল, কোন্‌টি অপ্রবল, তা সুনিশ্চয় করে এখন বলা যায় না। একটি বিস্ময়কর মিশ্রণের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের মানুষ একটি মিশ্রিত জাতিসত্তার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানের বিভাজন ছিল পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানরূপে। কিন্তু তবুও পাকিস্তানের মানুষ চিহ্নিত রয়েছিল পাঞ্জাবীরূপে, পাঠানরূপে, সিন্ধীরূপে, বেলুচীরূপে এবং বাঙালীরূপে। অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবে অনবরত বিরোধ-বিসংবাদের পটভূমিতে একটি পাকিস্তানী সত্তা গড়ে উঠতে পারেনি। আমি একটি কবিতায় সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের পরিচিতিটি অস্বীকার করে 'পূর্ব বাংলা' লিখেছিলাম। লিখেছিলাম, 'আমার পূর্ব বাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ অন্ধকারের তমাল'।

বাংলাদেশ এখন স্বাধীন হয়েছে। আমাদের এখন দেশভিত্তিক একটি পরিচয় গড়ে উঠেছে। পাকিস্তান আমলে ভৌগোলিক সংঘবদ্ধতার অভাবে সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত বৈচিত্র্যের কারণে আমরা পাকিস্তানী হতে পারিনি। কিন্তু এখন সে সমস্যা নেই। এখন আমাদের সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত অবস্থান রয়েছে। এই ভৌগোলিক সীমানার দায়ভাগ নিয়েই আন্তর্জাতিকভাবে আমরা পরিচিত। রাষ্ট্রীয়ভাবে এই পরিচয়টি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। অন্য দেশের ভূখণ্ডের ওপর আমাদের দাবি নেই। মধ্যযুগের মত চতুর্দিকে অধিকার ছড়িয়ে আমাদের দেশকে আমরা ভৌগোলিকভাবে প্রসারিত করতে পারব না। আমরা আমাদের ভৌগোলিক সীমানার পরিবেশ নিয়ে, আবহাওয়া নিয়ে এবং ভূ-প্রকৃতি নিয়ে সব সময় বসবাস করব– এটাই আমাদের ভাগ্য। এই ভাগ্যকে মান্য করেই আমরা বাংলাদেশী।

www.pathagar.com

যারা অধীর আগ্রহে নিজেদেরকে বাঙালী বলেন, তাঁরা বলেন যে, বাংলাদেশী জুতো হয়; কিন্তু মানুষ হবে বাঙালী। কথাটি একটি বিকৃত রুচির পরিচয় বহন করে। নিজের দেশকে জুতোর সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে দেশ-বহির্ভূত বলে যারা চিহ্নিত করেন, কেউ যদি তাদেরকে দেশদ্রোহী বলেন, তাহলে কি অন্যায় বলা হবে? ইংল্যান্ডে আমি অনেকবার গিয়েছি, জুতোর প্রতি আকর্ষণ ছিল আমার সব সময়। লন্ডনে আমি ইংলিশম্যানের দোকান থেকে ইংলিশ স্যু ক্রয় করেছি। জার্মানীর ফ্রাঙ্কফোর্টে একজন জার্মান মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে একটি জার্মান দোকান থেকে জার্মান স্যু ক্রয় করেছি। ফ্রান্সে একজন ফরাসী দোকানদারের কাছ থেকে আমি ফরাসী জুতো ক্রয় করেছি। আধুনিককালে সর্বোচ্চ আধুনিক সভ্যতার অধিকারী ইংরেজদের পক্ষে, জার্মানদের পক্ষে এবং ফরাসীদের পক্ষে দেশগত পরিচিতিই একমাত্র পরিচিতি হিসেবে সর্বজনগ্রাহ্য। সেসব দেশে যেমন জুতোর পরিচয় দেশের নামে, তেমনি মানুষের পরিচয়ও দেশের নামে। মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, জাতিসত্তার দ্বারা তাদের পরিচয় নয়, দেশগত পরিচয় দ্বারা তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা। পৃথিবীর কাছে এরা পরিচিত লিবীয়, মিসরীয়, সৌদি এবং ইরাকী বলে। তাদের আরব জাতিসত্তা তাদের পরিচিতি এবং স্বীকৃতি বোঝায় না। ভাষাগত, ধর্মগত এবং নৃতত্ত্বগত ঐক্য নিয়েই কেউ লিবীয়, কেউ মিসরীয়, কেউ সিরীয় ইত্যাদি। এ তথ্যটা গভীরভাবে অনুধাবন করলে সূর্যের মত জাজ্বল্যমান হয়। ভৌগোলিক সত্তাটাই বর্তমান বিশ্বের প্রত্যেক দেশের জন্য একমাত্র প্রবল সত্তা। ইউরোপের জাতিগত সত্তায় দেশ নির্মাণের চেষ্টায় হিটলার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। একটি বিশুদ্ধ আর্যজাতির অবস্থানের সীমানা তৈরী করতে গিয়ে তিনি যে বর্বর সংঘর্ষ নির্মাণ করেছিলেন, তাকে আমরা যুক্তিযুক্ত বলে কখনও সম্মান করতে পারিনি। জাতিগত সত্তাটি ইউরোপের জন্য ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। আজও ইউরোপে এই জাতিগত সত্তার সংঘর্ষ চলছে। বসনিয়ার তুর্কী বংশোদ্ভূত সার্বদের ওপর হিটলারের আক্রমণ বীভৎস জাতিগত রোষের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বর্তমান পৃথিবীতে আমরা বাংলাদেশী এবং এটাই আমাদের অনিবার্য এবং একান্ত পরিচয়।

বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বাংলাদেশে আছে এবং পশ্চিমবঙ্গেও আছে। পশ্চিমবঙ্গের কোন মানুষকে আমি শুধুমাত্র বাঙ্গালী পরিচয়ে সন্তুষ্ট থাকতে দেখিনি। লেখক, সাংবাদিক, সরকারী কর্মচারী এবং আরও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ যাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি তাদের প্রত্যেকেই ভারতীয় বলে গর্ব করেছেন। অর্থাৎ, সর্বভারতীয় যে ভৌগোলিক সত্তা, সেই সত্তার অংশভাগী হিসেবে এরা প্রত্যেকে গর্ববোধ করেছেন। সকল বাঙ্গালীকে এক করবার কোন প্রবণতা অথবা রাজনৈতিক চেতনা তাদের কারও মধ্যেই আমি দেখিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের অনেকের মধ্যে এখনও পাকিস্তানকালীন মানসিকতা বিদ্যমান। পাকিস্তানকালে তারা

www.pathagar.com

যেমন পাকিস্তানী হতে পারেননি, বাংলাদেশেও তেমনি বাংলাদেশী হতে পারছেন না। নিজেকে পাকিস্তানী হিসেবে না ভাববার পিছনে কারণ হিসেবে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং ভাষাগত যুক্তি ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ নিজেকে বাংলাদেশী হিসেবে না ভাববার পিছনে কোন যুক্তি আছে কি?

ইউরোপের অনেক দেশে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এখন চেষ্টা চলছে এশীয় এবং আফ্রিকাবাসীকে নিম্নমানের অথবা দ্বিতীয় পর্যায়ের নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করার। তাই সেসব দেশে সাদা মানুষদের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করে অন্যদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এর ফলে সর্বত্রই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছে। এটা কখনই কাম্য হতে পারে না। আমাদের দেশে এ অবস্থা হতে কখনই ছিল না এবং এখনও নেই। আমরা সবাই বাংলাদেশী নাগরিক। আমরা যেমন বাংলাদেশী নাগরিক, চাকমা, ওঁরাও এবং মুরংরাও বাংলাদেশী নাগরিক। বাংলাদেশী হিসেবেই সকলের সঙ্গে আমাদের ঐক্য বন্ধন সম্ভবপর, বাঙ্গালী হিসেবে নয়।

পৃথিবীর সকল দেশেই দেশগত সত্তাই জাতিগত সত্তাকে লালন করে এবং জাতিগত সত্তাকে একটি বিশেষ ভৌগোলিক ভূখণ্ডের অন্তর্গতরূপে নির্ণয় করে। পৃথিবীর যে কোন দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এর প্রমাণ আমরা পাব। ফরাসী দেশে যারা বাস করে, তারা ফরাসী, জার্মান দেশে যারা বাস করে, তারা জার্মান, স্পেনে যারা বাস করে, তারা স্প্যানিস এবং এভাবে অজস্র নাম উচ্চারণ করা যায়। একই জাতি আবার ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কারণে বিভিন্ন দেশগত বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হয়েছে। বুলগেরিয়রা স্লাভ জাতি-গোষ্ঠীর অন্তর্গত, রুশরাষ্ট্র তাই। কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে এবং দেশগতভাবে বুলগেরিয়ার অধিবাসীরা বুলগেরীয় এবং রুশ দেশের অধিবাসীরা রুশীয়। জাতিগত চৈতন্যের চাইতেও দেশগত চৈতন্যই সর্বাপেক্ষা কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া নৃ-তাত্ত্বিক বিচারে একই জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত, তাদের ভাষাও এক। তারা সবাই মালয়। কিন্তু তাদের গৌরব, প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ইন্দোনেশীয় বলে এবং মালয়ী বলে। স্বাধীনতা তাদের জন্য যে দু'টি ভূমণ্ডল নির্মাণ করেছে, এই ভূ-মণ্ডল দু'টিই তাদের জন্য সর্বস্ব। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, একটি দেশের মানুষ স্বাধীন সত্তা বজায় রাখার জন্য এবং আন্তর্জাতিকভাবে তাদের অভিপ্রায়কে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেশগত সত্তাকে চিরস্থায়ীভাবে মান্য করে নিয়েছে। এটাই কাম্য, এটাই রীতি এবং এটাই স্বাভাবিক। আমরা আফ্রিকার দিকে যদি তাকাই, তাহলে আফ্রিকার উত্তরে অনেক আরব দেশ দেখি। এদের সকলের জাতিসত্তা সেমেটিক। একমাত্র নৃ-তত্ত্ববিদদের কাছে তারা সেমেটিক হিসেবে বিচার্য হচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তারা মিসরীয়, সুদানী, লিবীয় অথবা আলজেরীয়। একসময় জামাল আব্দুন নাসের আরব জাতীয়তাবাদ নির্মাণের চেষ্টা

www.pathagar.com

করেছিলেন। সে সময় একজন লেবাননী ঐতিহাসিক 'নাহ্নু ওয়া তারিখ' নামক একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ছিল যে, জাতিগত সত্তায় আরবদের একত্রিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু নাসেরের জীবৎকালেই এ স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছিল। আফ্রিকার আরব দেশগুলো আপনাপন ভৌগোলিক সংস্থিতিতে নিজ নিজ জাতীয়তা তৈরী করে নিল। এটাই স্বাভাবিক ছিল এবং এ স্বাভাবিকতাকে কখনই অস্বীকার করা যায় না।

আফ্রিকার নিগ্রো দেশগুলোর কথা একবার চিন্তা করা যাক। নাইজেরিয়া, ঘানা, সেনেগাল– এই তিনটি দেশকে যদি আমরা ধরি, তাহলে আমরা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তাকে পাই। অবশ্য নৃ-তত্ত্ববিদদের কাছে এসব দেশের জাতিসত্তা অন্যরকম। এদের কেউ সুদানী-নিগ্রো, কেউ বান্টু-নিগ্রো আবার কেউবা ম্যানডিঙ্গো নিগ্রো। ভৌগোলিক প্রয়োজনে এবং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আধুনিককালে এ পরিচয়ের তেমন গুরুত্ব নেই। এক নাইজেরিয়ার মধ্যে নিগ্রো জাতির অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে এবং বিভিন্ন জাতিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কারণে এদের মধ্যে সংঘর্ষ প্রায়ই বাধে। এই সংঘর্ষ দূর করে একটি নাইজেরীয় ঐক্য বন্ধন নির্মাণের চেষ্টা সেখানে চলছে। আধুনিক বিশ্বের এটাই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। গোত্রগত চিহ্নিতকরণের দিন অতীত হয়েছে, এখনকার সময় হচ্ছে রাষ্ট্রগত চিহ্নিতকরণের।

ভৌগোলিক এবং রাষ্ট্রীয় সত্তা যে আধুনিক জাতিসত্তার লালনভূমি হয়, তার প্রমাণ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এদেশ আবিষ্কৃত হওয়ার পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মানুষরা এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। তারা ক্রমশঃ তাদের কৃষিকাজের জন্য এবং অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য আফ্রিকা থেকে অনেক কালো মানুষকে ক্রীতদাস করে নিয়ে আসে। এদেরই সন্তান-সন্ততিরা আজ আমেরিকার জাতিগত সত্তা নির্মাণ করেছে। যারা ইংরেজ ছিল তারা আর ইংরেজ নয়, যারা আফ্রিকান ছিল তারা আর আফ্রিকান নয়। এমনিভাবে পূর্বতন জাতিসত্তার পরিচয়ে কেউ আর চিহ্নিত নয়। তারা এখন যে দেশের অধিবাসী, সে দেশের নামেই পরিচিত অর্থাৎ তারা সবাই আমেরিকান।

একটি দেশের একজন মানুষের আত্মাভিমান তার দেশকে নিয়ে, তার নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় নিয়ে নয়। পৃথিবীর ইতিহাস তার প্রমাণ বহন করছে। বাংলাদেশের মানুষ সেই প্রমাণের অধিকারেই বাংলাদেশী। নৃ-তত্ত্বের কূটবিচারে আমাদের জাতিসত্তা নির্ধারণ করা দুরূহ কর্ম। ভৌগোলিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে একটি নির্ণেয়রূপে আমরা বাংলাদেশী। আমাদের সংবিধানে আমাদের দেশের নাম রাখা হয়েছে 'বাংলাদেশ'। সংবিধানগত নির্দেশনায় আমরা বাংলাদেশের নাগরিক, সুতরাং বাংলাদেশী। এই বাংলাদেশী পরিচয়েই আমাদের দেশগত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, আমাদের গৌরব এবং অহমিকা।

www.pathagar.com